ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

মাঘ-চৈত্র ১৪৩২
জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

"অভয়াশ্রম রক্ষা হলে, দেশ ভরবে মাছে-জলে"

"ইলিশ অভয়াশ্রমে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকুন ইলিশের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করুন" মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর ধারা ৩ এর উপধারা ৫ অনুযায়ী ৫টি অভয়াশ্রমে ১ মার্চ হতে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত আইনসমূহ ভঙ্গ করলে আইন ভঙ্গকারী মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধিত) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী অনধিক ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

ক্র.নং	ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকা	সকল প্রকার মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়
০১	চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কিলোমিটার এলাকা)	মার্চ-এপ্রিল
০২	ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখা নদীর ৯০ কিলোমিটার এলাকা)	
০৩	ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত। (তেতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকা)	
০৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলা এবং চাঁদপুর জেলার উত্তর মতলব উপজেলার মধ্যে অবস্থিত পদ্মা নদীর ২০ কিলোমিটার এলাকা।	
০৫	বরিশাল জেলার হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ ও বরিশাল সদর উপজেলার কালাবদর, গজারিয়া ও মেঘনা নদীর প্রায় ৮২ কিলোমিটার এলাকা।	

কেন অভয়াশ্রম প্রয়োজন?

১. মাছের নিরাপদ প্রজনন ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে।
২. বিলুপ্তপ্রায় দেশি প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করতে।
৩. জাটকা ও মা মাছকে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে। জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে।

অভয়াশ্রম এলাকায় আমাদের করণীয়

১. অভয়াশ্রম ঘোষিত এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে সব ধরণের মাছ ধরা থেকে বিরত থাকুন।
২. কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জাল বা ক্ষতিকর সরঞ্জাম ব্যবহার করবেন না।
৩. অভয়াশ্রম এলাকায় কোনো প্রকার আবর্জনা বা বিষাক্ত পদার্থ ফেলবেন না।
৪. মা মাছ ও জাটকা নিধনকারীকে নিরুৎসাহিত করুন এবং আইন মেনে চলতে সহায়তা করুন।

মাছ আমাদের সম্পদ, এই সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।

প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক
। । । আমিষ বার্তা । । ।
২য় বর্ষ
২য় সংখ্যা (৬ষ্ঠ প্রকাশনা)
মাঘ-চৈত্র ১৪৩২
জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
উম্মে হাবিবা
উপপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. মনিরুজ্জামান তরফদার
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
ও
মাহবুবা খানম
তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)

সহযোগী সম্পাদক
মো. সামছুল আলম
গণযোগাযোগ কর্মকর্তা

সার্বিক সহযোগিতায়
ইয়াসমিন আক্তার
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
নুসরাত মমতাহিনা
চিত্রশিল্পী

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও সম্পাদনা শাখা
০২-৫৫০১২৮০৫-৭

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

ই-মেইল :
headquarter@flid.gov.bd
iol@flid.gov.bd
iof@flid.gov.bd

ওয়েবসাইট
www.flid.gov.bd

সম্পাদকীয়

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ-এই তিনটি খাত দেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি। সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ খাতগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে পারলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি আরও শক্তিশালী ও টেকসই হবে। দেশের পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরি শিল্পের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে নীতি সহায়তা ও সরকারি প্রণোদনা দিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রাণিসম্পদ সেবা খামারিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সারা দেশের জন্য মোট ৪৭৫টি এমভিসি (মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক) ক্রয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩৫টি ওয়েট মার্কেট নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৩টি জেলা শহরে আধুনিকমানের জেলা কসাইখানা (স্লটার হাউজ) নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংস সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। কৃষক, চাষি-খামারিদের ঋণ সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে সরকার ১০ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ মওকুফ করেছে। ইতোমধ্যে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে জনগণের কল্যাণে কাজ করার প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে নিম্নআয়ের সারাদেশে প্রায় ১০ লক্ষাধিক পরিবারকে সুলভ মূল্যে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য (দুধ, ডিম, ও মাংস) সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকার গবাদি পশু পালনকারীর ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে, সহজ ঋণ ও বীমা সুবিধা এবং বাজারজাতকরণের জন্য ফার্মাস কার্ড চালুর উদ্যোগ ইতোমধ্যে নিয়েছে। অন্যদিকে প্রাণিসম্পদ খাতে নবীন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে এ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে। তাছাড়া জাতীয় চিড়িয়াখানাকে আন্তর্জাতিক মানের, লাভজনক ও দর্শনার্থীবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে কাজ করছে সরকার। এর জন্য চিড়িয়াখানার বেহাত হওয়া ৭ একর জায়গা দ্রুত পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার। দেশের খাল-বিল, নদী-নালা ও জলাশয়সমূহ মৎস্য সম্পদের মূল ভাণ্ডার। জলমহাল, উপকূলীয় খাল ও হাওরের ইজারা প্রথা বিলুপ্ত করে এগুলো 'জাল যার জলা তার' এই নীতির ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে। তাছাড়া রোগমুক্ত পোনা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, হ্যাচারিগুলোতে পিসিআর ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি করা, মৎস্যচাষিদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অ্যাকুয়াকালচার গ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে সরকারি উদ্যোগে। সরকারি সহায়তায় মৎস্য গবেষকদের গবেষণায় সাগর, হ্রদেও নতুন নতুন মাছের প্রজাতি উদ্ভাবন হচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় চিংড়ির একটি বৈশ্বিক ব্রান্ড তৈরি এবং সাগরের টুনা মাছ সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং বিদেশে সুপারশপগুলোতে মানসম্মত সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সুগম করে এই খাতের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ সংখ্যায় প্রকাশিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সকল ইতিবাচক সংবাদ সর্বস্তরের মানুষের উপকারে আসবে। আশাকরি এবারের আমিষ বার্তায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদখাতের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি দেশে ও দেশের বাহিরে ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে এ খাত সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দেশ সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
০১.	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত দেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী	০৩
০২.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে মো. দেলোয়ার হোসেন এর যোগদান	০৪
০৩	পাঙ্গাশের মড়ক ও জৈব নিরাপত্তায় অসচেতনতা ও করণীয়	০৪-০৫
০৪.	বিসিএস লাইভস্টক কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা কৃষি সম্ভাবনাকে অর্থনীতির শক্তিতে রূপান্তরিত করবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, খাদ্য এবং কৃষি মন্ত্রী	০৫-০৬
০৫.	কাপ্তাই হ্রদে মাছের নতুন দুই প্রজাতির সন্ধান	০৬-০৭
০৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চাই : প্রতিমন্ত্রী, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু	০৭
০৭.	মাছ কাটার বঁটিতেই অভাব কেটেছে ফারজানা, রেনু ও রোকেয়াদের	০৭-০৮
০৮.	শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তুললে দেশ পাবে সুন্দর প্রজন্ম : কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য মন্ত্রী	০৯
০৯.	চাকরি ছেড়ে উদ্যোক্তা, সামুদ্রিক শৈবালে বড় ব্যবসার স্বপ্ন মারিয়ার	০৯-১০
১০.	চিড়িয়াখানাকে আন্তজার্তিক মানে উন্নীত করতে কাজ করছে সরকার : প্রতিমন্ত্রী, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু	১০-১১
১১.	হাঁস পালন করে স্বাবলম্বী বুলবুলি	১১
১২.	সমন্বিত কৃষির উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী	১২
১৩.	সাটুরিয়ায় দুধের জোয়ার, ঘণ্টায় বিক্রি ৩০০ মণ	১২-১৩
১৪.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত	১৩-১৪
১৫.	পোল্ট্রি ও ডেইরি ফার্ম থেকে বছরে আয় কোটি টাকা	১৪-১৫
১৬.	রমজানে ১০ লক্ষ পরিবারকে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস দেবে সরকার: প্রতিমন্ত্রী, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু	১৫-১৬
১৭.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিবের তথ্য দপ্তর পরিদর্শন	১৬
১৮.	নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	১৬-১৭
১৯.	মাছ চাষে অ্যাকোয়া-ড্রাগসের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে করণীয়	১৭-১৮
২০.	মৎস্য খামারি খাইরুল আমিন এর সফলতার গল্প	১৮-১৯
২১.	সায়েন্টিফিক উপায়ে ঘাস চাষ এর মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানো সম্ভব-সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১৯
২২.	বেকারত্বের জাল ছিঁড়ে গাড়ল খামারে স্বাবলম্বী ওয়াসিম	১৯-২০
২৩.	মাছ নিয়ে ফারজানার সফল উদ্যোগ, এখন কর্মী ৭০	২০-২১
২৪.	জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার	২২
২৫.	স্নাতকের শিক্ষার্থী হামিম এখন সফল খামারি	২৩
২৬.	মাছ চাষে বাজিমাত বাবুল মিয়ার	২৪
২৭	টিউশনির টাকায় শুরু হওয়া আসাদুজ্জামানের 'আমার খামার' এখন যেন সবার	২৫
২৮.	২ বিলিয়ন ডলার চিংড়ি রপ্তানিতে মাস্টার প্ল্যান	২৫-২৭
২৯.	উন্নত জাতের ফ্রিজিয়ান গাভির কালো-সাদা ছোপে বদলে গেছে বাইশপাড়া গ্রামের প্রায় ২৮০ পরিবার	২৭-২৮
৩০.	দেশ গঠনে অবদান রাখলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল্যায়ন করবে সরকার : খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী	২৮
৩১.	মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নিম্ন আয়ের মানুষে স্বস্তি	২৯-৩০
৩২.	নাটোর থেকে হাজার কোটির তাজা মাছ যাচ্ছে সারা দেশে	৩০-৩১
৩৩.	১টি গরু থেকে সফল খামারি জহিরুল ইসলাম	৩১
৩৪.	মাছ চাষে ফরহাদ-এর বাৎসরিক আয় ১১ লক্ষ টাকা	৩২
৩৫.	গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিক টুনার হাতছানি	৩২-৩৩
৩৬.	গরুর খামারেই জ্বালানির সমাধান নুরুল হুদার	৩৩
৩৭.	নারীর অধিকার কেবল স্বীকৃতিতে নয়, বাস্তবায়নেও গুরুত্ব দিতে হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	৩৪
৩৮.	তীব্র তাপদাহে মৎস্য চাষিদের করণীয়	৩৫
৩৯.	তীব্র তাপদাহে প্রাণিসম্পদ খামারিদের করণীয়	৩৬

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত দেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ বলেছেন, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এই তিনটি খাত দেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি। সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ খাতগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে পারলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি আরও শক্তিশালী ও টেকসই হবে। মন্ত্রী গত ১৮ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি বিশ্বাস করেন দেশে কৃষির উন্নয়ন হলে প্রধান অর্থনীতি স্থিতিশীল হবে। তিনি বলেন, বিশ্বের অনেক দেশ বছরের ছয় থেকে আট মাস বরফে আচ্ছাদিত থাকে, তবুও তারা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে বারো মাস ফসল উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর জমি আমাদের বড় সম্পদ। বাংলাদেশকে সেরা ও সুন্দর রাষ্ট্রে পরিণত করতে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, মাছ ও ভাত বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি যান না কেন, তিনি ভাত ও মাছের স্বাদ খোঁজেন। এটি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ। তিনি বলেন, সংশিষ্ট সকল অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে কৃষি উৎপাদনে বিশ্বে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকার জনকল্যাণে আন্তরিক। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আমরা দায়িত্ব পালন করছি। দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কৃষিপণ্য রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। তবে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। দুর্নীতিমুক্ত ও পেশাদারিত্বপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে ইতিহাস সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। মতবিনিময় সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও খাদ্য প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। অতীতে রাষ্ট্র পরিচালনায় যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, দেশের খাল-বিল, নদী-নালা ও জলাশয়সমূহ মৎস্যসম্পদের মূল ভাণ্ডার। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অনেক জলাশয় ভরাট ও দখল হয়ে গেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এসব জলাশয় চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে মন্ত্রণালয় থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করা হবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে সেক্টরভিত্তিক বৈঠকের মাধ্যমে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীও কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন এবং বিশ্বাস করেন যে কৃষির উন্নয়নই টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন অধিদপ্তর ও দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। **সূত্র: (মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)**

"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে মো. দেলোয়ার হোসেন এর যোগদান

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন গত ২৭ মার্চ ২০২৬ তারিখ শুক্রবার পূর্বাহ্নে সচিব পদে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন। গত বুধবার ২৫ মার্চ ২০২৬ তারিখের জনপ্রশাসন মন্ত্রণা-লয়ের উর্ধ্বতন নিয়োগ-১ শাখার ০৫.০০.০০০০.০০০.১৩০.১২.০০০১.২৬.৩০৭ সংখ্যক স্মারকমূলক এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে পদায়ন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পদায়নের পূর্বে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসাবে কর্মরত ছিলেন। জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১১ ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি ১৯৮২ সালে এসএসসি এবং ১৯৮৪ সালে এইচএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়নে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। **(সূত্রঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)**

পাঙ্গাশের মড়ক ও জৈব নিরাপত্তায় অসচেতনতা ও করণীয়

বাংলাদেশের মৎস্য খাত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অন্যতম শক্ত ভিত্তি। অভ্যন্তরীণ চাহিদাপূরণ থেকে শুরু করে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে এই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন চাষযোগ্য মাছ-বিশেষ করে পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, রুই-কাতলা জাতীয় মাছ-বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক হারে মারা যাচ্ছে। পাঙ্গাসের রোগাক্রমণ ও বিস্তারের পেছনে মূলত যে কারণগুলো কাজ করে তার মধ্যে রয়েছে চাষিদের সচেতনতার ঘাটতি এবং বায়োসিকিউরিটির অভাব, মৃত মাছ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতা, দ্রুত লাভের আশায় অতিরিক্ত ঘনত্বে মাছ ছাড়া, নিম্নমানের খাদ্য ব্যবহার, পানির মান নিয়মিত পরীক্ষা না করা, চাষিদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, রোগের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্তে অক্ষমতা এবং দোকানির পরামর্শে নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক প্রয়োগের প্রবণতা, যার ফলে রোগ কমার বদলে আরও জটিল আকার ধারণ করে এবং মড়কের মাত্রা বেড়ে যায়। বায়োসিকিউরিটির অভাব ও চাষিদের সচেতনতার ঘাটতির কারণে সাম্প্রতিক মাছের ঘেরে যে ব্যাপক মড়ক দেখা যাচ্ছে, তা মূলত চাষ ব্যবস্থার একটি কাঠামোগত দুর্বলতারই প্রতিফলন। অনেক চাষি ঘের প্রস্তুতি, পানি ব্যবস্থাপনা, সরঞ্জাম জীবাণুমুক্তকরণ, পোনা কোয়ারেন্টাইন, মৃত মাছের সঠিক নিষ্পত্তি এবং বাইরের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মতো মৌলিক বায়োসিকিউরিটি নিয়মগুলো মানেন না; ফলে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও পরজীবী সহজেই পুকুরে প্রবেশ করে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অতিরিক্ত ঘনত্বে মাছ চাষ, নিম্নমানের খাদ্য ব্যবহার, পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, অ্যামোনিয়া পরীক্ষা না করা, রোগ দেখা দিলে ভুল চিকিৎসা প্রয়োগ এবং অকার্যকর বা নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। এর ফলে মাছ স্ট্রেসে পড়ে রোগপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং স্বল্প সময়ে ব্যাপক মৃত্যু ঘটে, যা চাষির অর্থনৈতিক ক্ষতি, পরিবেশ দূষণ ও খাদ্য নিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পাঙ্গাশ চাষে

রোগাক্রান্ত মৃত মাছ অপসারণ ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবহেলিত বিষয় । অনেক সময় দেখা যায় চাষিরা মৃত মাছ পুকুরপাড়ে ফেলে রাখেন। যা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি, রোগ বিস্তার ও পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ। এ বিষয়ে চাষিদের সচেতনতার অভাব আজও প্রকট, ফলে সাম্প্রতিক পাঙ্গাশ ঘেরে যে ব্যাপক মড়ক দেখা দিচ্ছে তার একটি বড় অংশ এই অব্যবস্থাপনার ফল হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। সাধারণত যখন কোনো ঘেরে রোগ দেখা দেয়, তখন প্রথমেই কিছু মাছ দুর্বল হয়ে পানির ওপর ভেসে ওঠে, খাবার গ্রহণ বন্ধ করে দেয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়। কিন্তু অধিকাংশ চাষি বিষয়টিকে প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুত্ব না দিয়ে অপেক্ষা করেন, ফলে মৃত রা মৃতপ্রায় মাছ দীর্ঘ সময় পানিতে অবস্থান করে এবং দেহ পচনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অ্যামোনিয়া, সালফাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়, যা সুস্থ মাছের দেহে প্রবেশ করে রোগ ছড়িয়ে দেয়। এর মাধ্যমে রোগজীবাণু এক ঘের থেকে আরেক ঘের

এমনকি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামেও ছড়িয়ে পড়তে পারে, ফলে স্থানীয় পর্যায়ে এক ধরনের রোগ বিস্ফোরণ ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয় এবং শুধু যে আশপাশের পরিবেশকে দূষিত করে তা নয়, বরং স্থানীয় জলাশয়ের অন্যান্য মাছ, হাঁস-মুরগি ও এমনকি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যও মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। অনেকসময় মৃত মাছ সংগ্রহে ব্যবহৃত জাল, ডালা, বালতি বা নৌকা কোনোভাবেই জীবাণুমুক্ত করা হয় না এবং সেগুলো একই অবস্থায় অন্য ঘেরেও ব্যবহার করা হয়, যার ফলে একটি ঘেরের রোগ অন্য ঘেরে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে চাষিদের বড় অংশই সচেতন নন। এই প্রেক্ষাপটে করণীয়- ১. সঠিক ঘনত্বে মাছ চাষ করতে হবে । ২. হ্যাচারি ও ফিডের মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ৩. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘের পর্যবেক্ষণ করে ভাসমান, দুর্বল ও মৃত মাছ দ্রুত অপসারণ করতে হবে। ৪. কোনো অবস্থাতেই মৃত মাছ পানিতে ভাসতে দেওয়া বা পুকুরপাড়ে ফেলে রাখা যাবে না; ২৩ ফুট গভীরে চুন/ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পুঁতে ফেলতে হবে বা নিরাপদভাবে ধ্বংস করতে হবে। ৫. মৃত মাছ সংগ্রহের জাল, ডালা, বালতি ইত্যাদি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ৬. হাত, পা ও পোশাক জীবাণুমুক্ত না করে এক ঘের থেকে অন্য ঘেরে প্রবেশ করা যাবে না। ৭. চাষিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে। ৮. যত্রতত্র ওষুধ বা রাসায়নিক প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে । ৯. ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা যেতে পারে । ১০. বায়োসিকিউরিটি নীতিমালা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। পাঙ্গাশ চাষ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন উৎস ও অর্থনৈতিক খাত, যদি এই খাত মড়কের শিকার হয়, তবে তা শুধু চাষিদের ব্যক্তিগত ক্ষতিই নয়, বরং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্যও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে; তাই চাষিদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও বায়োসিকিউরিটি কঠোরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাঙ্গাশ চাষকে একটি নিরাপদ, টেকসই ও লাভজনক খাতে রূপান্তর করা এখন সময়ের দাবী।

লেখক: ১. ফারজানা জান্নাত আঁখি, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি কেন্দ্র, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট।

২. ড. মো. সিরাজুম মনির, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সদরদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট।

৩. আসমা জামান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি কেন্দ্র, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট।

"করবো কাজ, গড়বো দেশ
সবার আগে বাংলাদেশ"

বিসিএস লাইভস্টক কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা কৃষি সম্ভাবনাকে অর্থনীতির শক্তিতে রূপান্তরিত করবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, খাদ্য এবং কৃষি মন্ত্রী

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ বলেছেন, সঠিক পরিকল্পনা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও মাঠপর্যায়ের কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে এগ্রো-প্রোডাক্টকে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নবীন কর্মকর্তারা মাঠমুখী হয়ে কাজ করলে কৃষি সম্ভাবনা অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পাশাপাশি দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) বিকালে রাজধানীর মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে ৪৪তম বিসিএস (লাইভস্টক)-এর নবনিযুক্ত ক্যাডার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে পাঁচ দিনব্যাপী অবহিতকরণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, সীমিত কৃষি মৌসুম থাকা সত্ত্বেও (বিদেশিরা) কৃষিকে অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হিসেবে গড়ে তুলেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অনুকূল জলবায়ু ও উর্বর মাটির কারণে সারা বছর ফসল উৎপাদন সম্ভব, তবে প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনে আরও উদ্যোগ প্রয়োজন। মন্ত্রী আরও বলেন, গরুর গোবরকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত ও প্রয়োগ করলে কেমিক্যাল সার কম ব্যবহার করা যাবে, পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত থাকবে। তিনি বলেন,"আমরা লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে কেমিক্যাল সার আনছি, কিন্তু যদি গোবর সঠিকভাবে ব্যবহার করি, তবে মাটি ও পরিবেশ দুটোই সুরক্ষিত হবে।" তিনি নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা মানুষের সঙ্গে সেবা প্রদানের দায়িত্বে আছেন। দেশের এই প্রাকৃতিক ও কৃষি সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও টেকসই বাংলাদেশ উপভোগ করতে পারবে। তিনি আরও বলেন, সততা, দায়িত্ববোধ এবং দক্ষতার সঙ্গে মাঠে কাজ করলে বাংলাদেশ কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা ক্ষেত্রে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম। মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের

উন্নয়নে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গবাদি পশু পালনকারীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, সহজ ঋণ ও বীমা সুবিধা এবং বাজারজাতকরণের জন্য ফার্মাস কার্ড চালুর উদ্যোগ ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতে জড়িত উদ্যোক্তারা এবং ক্ষুদ্র খামারিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করে দেশের প্রাণিসম্পদ শিল্পের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হবে। নবীন কর্মকর্তারা কর্মস্থলে যোগদান করে জনগণের সেবায় সক্রিয়ভাবে কাজ করলে এই খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মো. বয়জার রহমান। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. বেগম সামিয়া সুলতানা সহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে মন্ত্রী মেধাবী নবীন কর্মকর্তাদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করেন। **সূত্রঃ (মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা)**

কাপ্তাই হ্রদে মাছের নতুন দুই প্রজাতির সন্ধান

Sperata aorella

Tor barakoe

কাপ্তাই হ্রদে নতুন দুই প্রজাতির মাছের সন্ধান পেয়েছে মৎস্য গবেষক দল। সম্প্রতি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট রাঙামাটি কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে এ তথ্য জানা গেছে। গবেষণায় কাপ্তাই হ্রদে মোট ৮৬ প্রজাতির মাছের সন্ধান মেলে। এতে দেশি প্রজাতির ৭০টি, বিদেশি সাতটি, চিংড়ি প্রজাতির আটটি ও কচ্ছপ প্রজাতির একটি মাছের অস্তিত্ব রয়েছে। নতুন সন্ধান পাওয়া দুটি হলো আইড়ের নতুন প্রজাতি স্পেরেটো আওরেলো এবং মহাশোলের নতুন প্রজাতি টোর বেরাকি। আইড় মাছের বাহ্যিক গঠন ও অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গবেষণা দল দেখতে পান, এই মাছটি পূর্বে পরিচিত স্পেরেটো আওর (তলা আইড়) ও স্পেরেটো সিঙ্ঘালা (গুজি আইড়) প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরে কৌলিতাত্ত্বিক বিশেষণে মাছটির ডিএনএ নমুনার সঙ্গে স্পেরেটো আওরেলো নামক প্রজাতির আইড় মাছের জিনোমের শতভাগ মিল পাওয়া যায়। এই স্পেরেটো আওরেলো মাছটি আগে কখনও কাপ্তাই হ্রদে চিহ্নিত হয়নি, এবারই প্রথম। স্পেরেটো আওরেলো নামের এ নতুন প্রজাতিটি আকৃতিতে তুলনামূলকভাবে ছোট। এদের ওজন এক থেকে দেড় কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির দেহ লম্বা ও সরু, পৃষ্ঠদেশ ধূসর, পেটের দিক সাদাটে এবং দেহের পাশ রূপালি বর্ণের। মাথা থেকে পৃষ্ঠ পাখনার উৎপত্তি পর্যন্ত অংশটি সমান ঢালু, এডিপোজ ফিন পৃষ্ঠীয় পাখনার সমান দৈর্ঘ্যের এবং খাটো। এছাড়া মাছটির ম্যাক্সিলারি বারবেল প্রায় পুচ্ছ পাখনা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং চোয়াল গুজি আইড়ের মতো ছোট। গঠনগত দিক দিয়ে এর অক্সিপিটাল স্পাইন দীর্ঘ এবং এপিনিউরাল শিল্ড সরু। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি স্পেরেটো আওর এবং স্পেরেটো সিঙ্ঘালা থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত। অন্যদিকে মহাশোলের নতুন প্রজাতি টোর বেরাকির দেহ, মুখ অধোমুখী, মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট। মুখ ছোট, ঠোঁট পুরু। দুই জোড়া স্পর্শী বিদ্যমান। ম্যাক্সিলারি অপেক্ষাকৃত লম্বা। দেহের বর্ণ ওপরের দিকটা বাদামি সবুজ, পেটের দিকটা রূপালী। পৃষ্ঠ পাখনা লালচে। শ্রেণী ও পায়ু পাখনা কমলা বর্ণের। বাংলাদেশের নেত্রকোনায় কংস ও সোমেশ্বরী এবং সিলেট ও সুনামগঞ্জের পাহাড়ি নদীগুলোতে এই মাছ পাওয়া যায় বলে জানান বিজ্ঞানীরা। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) রাঙামাটি নদী-উপকেন্দ্রের প্রধান ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ইশতিয়াক হায়দার বলেন, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গত চার বছর ধরে কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন স্থানে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে ৮৬ প্রজাতির মাছের সন্ধান পায়। এর

মধ্যে মহাশোলের নতুন প্রজাতি টোর বেরাকি ও আইড়ের নতুন প্রজাতি স্পেরেটো আওরেলার সন্ধান পেয়েছি, যা এই গবেষণায় ভিন্ন মাত্রা এনেছে। গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নেন বি এম শাহিনুর রহমান, মো. খালেদ রহমান, রাবিনা আক্তার লিমা, মো. লিপন মিয়া, আজহার আলী, মো. রবিউল আওয়াল হোসাইন, মো. ইশতিয়াক হায়দার, মো. আমিরুল ইসলাম ও অনুরাধা ভদ্র।
(সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চাই: প্রতিমন্ত্রী, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন সময়ে জনগণের প্রত্যাশা ও অনুভূতির বিপরীতে অবস্থান নেওয়ার নজির থাকলেও বিএনপি সবসময় জনগণের সেন্টিমেন্ট ধারণ করে পথ চলেছে। তিনি বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে জনগণের আস্থা ও সমর্থন নিয়েই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চাই। ২২ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) সন্ধ্যায় সাভারস্থ বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত নবনিয়োগ প্রাপ্ত ৪৪তম বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের "৫ দিনব্যাপী অবহিতকরণ কোর্স"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি কখনোই দেশের মানুষের অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার বিপক্ষে অবস্থান নেয়নি। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও অধিকারভিত্তিক আন্দোলনে দলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষিভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, অন্যদিকে পরিবেশগত ভারসাম্যও রক্ষা পাবে। তাই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সমৃদ্ধ হলেই দেশ হবে উন্নত। নবনিযুক্ত ক্যাডার কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রের সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা রাষ্ট্রের কর্মকর্তা। কোনো ব্যক্তি বা দলের নয়রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষাই আপনাদের প্রধান দায়িত্ব। তিনি কর্মকর্তাদের উপজেলাসহ মাঠপর্যায়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল আচরণ ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রশিক্ষণার্থীরা এসময় উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্র: মো. মামুন হাসান (সিনিয়র তথ্য অফিসার) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।**

মাছ কাটার বঁটিতেই অভাব কেটেছে ফারজানা, রেনু ও রোকেয়াদের

রাজধানীর কোলাহল ছাপিয়ে কোথাও কোথাও রাত দুইটাতেও শোনা যায় বঁটির ধারালো শব্দ। সেই শব্দের প্রতিটি ছন্দে মিশে আছে টিকে থাকার লড়াই, আত্মসম্মান আর ভালোবাসার গল্প। ফারজানা, রেনু বেগম আর রোকেয়া বেগমের বয়স কিংবা জীবনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও আজ তারা এক কাতারে দাঁড়িয়ে। কেউ হারিয়েছেন সাজানো সংসার, কেউ লড়াই করছেন অসুস্থ স্বামীর নিশ্বাসটুকু সচল রাখতে, আবার কেউ আশি বছর বয়সে তিনটি অস্ত্রোপচার নিয়েও অন্যের কাছে হাত পাততে নারাজ। অনলাইনে মাছ বিক্রির প্রতিষ্ঠান রিভার ফিশে মাছ কাটার শ্রমসাধ্য কাজই এখন তাদের কাছে আনন্দ আর পরম সম্মানের। কারণ, এই বঁটিই তাদের দিয়েছে মাথা উঁচু করে বাঁচার রসদ। সমাজ যাকে 'ছোট কাজ' বলে দূরে ঠেলে দিতে চায়, সেই কাজকেই জীবনের ঢাল বানিয়ে এই তিন নারী প্রমাণ করেছেন ইচ্ছাশক্তি থাকলে শূন্য থেকেও নতুন এক পৃথিবী গড়া সম্ভব। শোনা যাক সেই তিন যোদ্ধার অদম্য জীবনযুদ্ধের গল্প।

ফারজানা রহমান : সন্তানদের ভবিষ্যতই যার মূলধন

রাজধানীর মেরুল বাড্ডার হাতিরঝিল সংলগ্ন নিজেদের বাড়ি, সচ্ছল সংসার আর স্বামীর গানের সুর সব মিলিয়ে ৩৮ বছর বয়সী ফারজানা রহমানের জীবনটা ছিল ছবির মতো সাজানো। কিন্তু জীবন সব সময় সরলরেখায় চলে না। স্বামীর মাদকাসক্তি আর মানসিক অসুস্থতা হঠাৎ করেই কালবৈশাখী হয়ে হানা দেয় তার সাজানো সংসারে। সেই সুযোগ নেয় আপনজনেরা; কৌশলে কেড়ে নেয় মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকুও। ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব ফারজানা রহমান তখন এক কঠিন সন্ধিক্ষণে। একদিকে

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অন্যদিকে তিন সন্তানের দায়িত্ব। কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী নন। আভিজাত্যের মোহ কিংবা 'লোকে কী বলবে' এমন দুশ্চিন্তাকে তুচ্ছ করে তিনি বেছে নিলেন কঠিন পরিশ্রমের পথ। ফারজানা রহমান বলেন, 'মানুষের বাসায় কাজ করা আমার কাছে অসম্মানের মনে হতো, কিন্তু এই মাছ কাটার কাজে আমি সম্মান পাই। এটাকে আমি আমার চাকরি মনে করি এবং এই কাজ করে আমি আনন্দ পাই। আমার সন্তানদের মানুষ করছি এই উপার্জন দিয়েই এটাই আমার কাছে বড় পাওয়া।' প্রতি মাসে ২০ থেকে ২২ হাজার টাকা আয় করেন তিনি। এই সামান্য আয়েই বোনা হচ্ছে তার সন্তানদের বড় হওয়ার স্বপ্ন। বড় মেয়ে একটি কলেজে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে পড়ছেন, মেজ ছেলে এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থী আর ছোট ছেলে পড়ছে প্রথম শ্রেণিতে। ফারজানার কাছে হারানো সম্পদ কিংবা হাতছাড়া হওয়া জমি আজ আর আক্ষেপের বিষয় নয়। তার প্রকৃত সম্পদ এখন সন্তানদের শিক্ষা আর তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

রেনু বেগম : যেখানে ক্ষুধা হার মানে ভালোবাসার কাছে

রাত যখন নিঝুম হয়ে আসে, তখন রেনু বেগমের (৪৫) দিন যেন নতুন করে শুরু হয়। ঘড়ির কাঁটা রাত দুটোর ঘর ছুঁইছুঁই, অথচ রেনুর হাতে ধারালো বঁটি আর রুপালি আঁশের মাছের পাহাড়। চারপাশ নিস্তব্ধ হলেও তার মনের ভেতর এক অদৃশ্য যুদ্ধের দামামা বাজে। গত দশ বছর ধরে এই যুদ্ধই তার নিত্যসঙ্গী। সকালে যখন তার সহকর্মীরা মিলে টিফিন ভাগ করে খান, হাসি গল্পে মেতে ওঠেন, রেনু তখন আড়ালে সরে যান। কেউ নাশতা সাধলে এক চিলতে হাসি দিয়ে বলেন, 'পেটটা আজ ভার হয়ে আছে, থাক না।' অথচ সেই হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক কঠিন সংকল্প। নিজের দুপুরের খাবারের টাকাটা বাঁচলে তবেই বিকেলের প্রেসারের ওষুধটা কেনা হবে; বিকেলে না খেয়ে থাকলে তবেই রাতে স্বামীর ইনসুলিনটা নিশ্চিত করা যাবে। রেনুর কাছে ক্ষুধার জ্বালা বড় নয়, বড় হলো তার অসুস্থ স্বামীর কষ্টের নিশ্বাস। গত মাসে হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে যখন ২৮ হাজার টাকার বেশি আয় করলেন, তখন সহকর্মীরা ভেবেছিল রেনু হয়তো এবার নিজের জন্য একটা ভালো শাড়ি কিনবেন। কিন্তু মাস শেষে সেই টাকার প্রতিটি পয়সা চলে গেল ওষুধের নীল-সাদা প্যাকেটে। দুই ছেলে বড় হয়েছে, তারাও চেষ্টা করছে, কিন্তু রেনু নিজের কাঁধ থেকে স্বামীর দায়িত্ব এক চুলও নামতে দেননি। রেনু বেগম বলেন, 'এই চাকরিটা আছে বলেই আমি আমার স্বামীর জন্য কিছু করতে পারছি। আমার নিজের ক্ষিদে বড় না গো, ওনার নিশ্বাসটুকু সচল রাখাই আমার আসল সার্থকতা'। ভোলায় বাড়ি রেনু বেগমের। তিনি এক নীরব যোদ্ধা, যার কাছে ভালোবাসার মানে হলো নিজের শেষ সম্বলটুকু বিসর্জন দিয়ে স্বামী বাঁচিয়ে রাখা।

রোকেয়া বেগম : তিন প্রজন্মের বঁটি ও বেঁচে থাকার লড়াই

শীতের সকালের কুয়াশা তখনো পুরোপুরি কাটেনি। রিভার শরীরটা জরাজীর্ণ, কিন্তু হাতের ধারালো বঁটি যখন মাছের আঁশ ছাড়ে, তখন বোঝার উপায় নেই যে এই বৃদ্ধার শরীরে তিন-তিনবার বড় ধরনের অস্ত্রোপচার হয়েছে। রোকেয়ার মাথায় টিউমার বাসা বেঁধেছিল। সেই মরণব্যাধির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে জীবনের সবটুকু সঞ্চয় খরচ হয়ে গেছে হাসপাতালে। মানুষ এই বয়সে এসে একটু আশ্রয়ের খোঁজ করে, অন্যের করুণার পাত্র

হয়। কিন্তু রোকেয়া অন্য ধাতুতে গড়া। মাথায় এখনো অস্ত্রোপচারের দাগ টাটকা, কিন্তু মনে কোনো দৈন্য নেই। গত ৫-৬ বছর ধরে তিনি মাছ কেটেই নিজের ওষুধের টাকা জোগাড় করছেন। রোকেয়া বেগম বলেন, 'সন্তানদের নিজেদেরই চলে না বাবা, আমাকে কী দেবে? হাত পাতার চেয়ে এই বঁটি চালানো অনেক সম্মানের। নিজেরটা নিজেই করছি, এতেই শান্তি।' রোকেয়ার এই জেদ কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার জীবনের সবচেয়ে অবাক করা দৃশ্য হলো একই জায়গায় মাছ কাটছেন তার মেয়ে এবং নাতনিও। অভাব আর ভাগ্যের ফেরে তিন প্রজন্মের নারীরা মিলে এক অনন্য যুদ্ধে নেমেছেন। রিভার ফিশের প্রতিষ্ঠাতা ফারজানা আক্তার বলেন, 'যখন তাদের দেখি, তখন তারা কেবল শ্রমিক নন, তারা একেকজন যোদ্ধা। শারীরিক অসুস্থতা আর সামাজিক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ফারজানা, রেনু আর রোকেয়ারা আজ এক অনন্য উদাহরণ।' **(সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)**

"মাছ কাটার বঁটির ধার নারী সাফল্যের জোয়ার"

শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তুললে দেশ পাবে সুন্দর প্রজন্ম : কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য মন্ত্রী

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ বলেছেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে দেশ একটি যোগ্য ও সুন্দর প্রজন্ম পাবে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি শনিবার কুমিল্লায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে হাজী মো. জহিরুল ইসলাম ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে নেউরা এম আই উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রাথমিক স্তরের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী মহোদয় বলেন, আল্লাহ ধন-সম্পদ দেওয়ার আগে মানুষের মনকে সমৃদ্ধ করেন। আয়োজক জহিরুল ইসলামের এই উদ্যোগ তার উদার মানসিকতারই প্রমাণ। তিনি বলেন, আজকের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও বলেন, সময় ও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ধরণ ও শিক্ষার্থীদের চাহিদাও বদলেছে। বর্তমান যুগে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্কুল ব্যাগও একজন শিক্ষার্থীর জন্য বড় সহায়তা হতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করে এবং সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যার যার অবস্থান থেকে সততা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। আজ যেসব শিক্ষার্থী সহায়তা পাচ্ছে, ভবিষ্যতে তারাই দেশের সম্পদ হয়ে সমাজের কল্যাণে অবদান রাখবে। নিজের দায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য-এই তিনটি খাত দেশের অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষকের ভাগ্য উন্নয়ন করতে পারলেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। এসময় তিনি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। হাজি মো. জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। **সূত্রঃ (মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা)**

চাকরি ছেড়ে উদ্যোক্তা, সামুদ্রিক শৈবালে বড় ব্যবসার স্বপ্ন মারিয়ার

কক্সবাজারের নুনিয়াছড়া এলাকায় সামুদ্রিক শৈবাল চাষ শুরু করেছেন উদ্যোক্তা মারিয়া রে। প্রায় দেড় একর জায়গায় উলভা ও গ্র্যাসেলেরিয়া-এ দুই ধরনের সামুদ্রিক শৈবাল চাষ করেন তিনি। কক্সবাজারে স্টারিনাস কিচেন দিয়ে শুরু হয় উদ্যোক্তা হিসেবে মারিয়ার যাত্রা। সেটি ২০২২ সালে। মূলত সি ফুড বা সামুদ্রিক মাছসহ নানা পদের খাবার বিক্রিই ছিল তার রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরুর মূল উদ্দেশ্য। পর্যটন মৌসুমে প্রতি মাসে তার এই রেস্টুরেন্টে পাঁচ লাখ টাকার ব্যবসা হয়। পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিশেষায়িত খাবার হিসেবে সি উইড বা সামুদ্রিক শৈবাল দিয়ে স্যুপসহ বিভিন্ন খাবার তৈরি করেন তিনি। ভালো সাড়াও পেয়েছেন তাতে। এরপর স্থানীয়ভাবে সামুদ্রিক শৈবাল সংগ্রহ করে তা থেকে শুকনা গুঁড়া ও সাবান তৈরি করে বিক্রি শুরু করেন মারিয়া। ২০২৫ সালে তিনি সামুদ্রিক শৈবালের তৈরি পণ্য ও সাবান বিক্রি করেন প্রায় দুই লাখ টাকার। ক্রেতাদের আগ্রহ দেখে গত নভেম্বরে কক্সবাজারের নুনিয়াছড়া এলাকায় নিজেই শুরু করেন সামুদ্রিক শৈবাল চাষ। প্রায় দেড় একর জায়গার ওপর উলভা ও গ্র্যাসেলেরিয়া ধরনের সামুদ্রিক শৈবাল চাষ শুরু করেন তিনি। মারিয়া বলেন, গ্র্যাসেলেরিয়া শৈবাল শীতকালে সমুদ্র উপকূলে পাওয়া যায়। সেগুলোকেই চাষের জন্য বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উলভা শৈবালের বীজ সংগ্রহ করা হয় কক্সবাজার কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে। সব মিলিয়ে ছয়টি জেলে পরিবারের নারী সদস্যরা এ চাষের সঙ্গে জড়িত। সামুদ্রিক শৈবাল চাষে সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততা ও আবহাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিবছরের নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এটি চাষ করা হয়। এক মাস পরপর শৈবাল সংগ্রহ করা যায় জমি থেকে। চলতি মৌসুমে প্রায় ২৪ টন উলভা ধরনের শৈবাল উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে মারিয়ার। এসব শৈবাল থেকে প্রায় দুই টন শুকনা শৈবাল উৎপাদন করার লক্ষ্য তার। এ ছাড়া আরও ৫০০ কেজি গ্র্যাসেলেরিয়া শৈবাল উৎপাদন হবে। সব মিলিয়ে চলতি বছর ৩০ লাখ টাকার শৈবাল বিক্রির আশা এই

উদ্যোক্তার। বর্তমানে তিনি অনলাইনে 'সি ফরেস্ট বিডি' নামে ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবাল বিক্রি করছেন। উদ্যোক্তা মারিয়া আরও বলেন, শৈবালে এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এ্যান্টিএজিং উপাদান এবং বিভিন্ন রকমের ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকায় একে বলা হয় 'সুপারফুড'। এ ছাড়াও বর্তমানে সামুদ্রিক শৈবালকে জৈব সার ও পশুর খাবার হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে । প্রাকৃতিক এই শৈবালকে কাঁচাও খাওয়া যায়। একই সঙ্গে এটি শুকিয়ে পাউডার বানিয়ে বা নির্যাস খাবার, প্রসাধনী এবং ওষুধেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিশু ও অন্যদের আয়োডিনের ঘাটতি পূরণসহ নারীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। কলসেন্টার থেকে শৈবাল চাষ, ঢাকায় ২০০৮ সালে একটি কলসেন্টারে ১৫ হাজার টাকা বেতনে চাকরি শুরু করেছিলেন মারিয়া রে। তবে শুরু থেকেই ব্যবসার প্রবল আগ্রহ ছিল মারিয়ার মনে। তাই দিনে ব্যবসার কাজ করার জন্য রাতের শিফটেও কাজ করতেন তিনি। সে সময় বিউটি পার্লার ও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। পরে একটি এ্যান্টিভাইরাস কোম্পানিতে বিপণন ব্যবস্থাপক হিসেবে দুই বছর চাকরি করেন। ২০১৮ সালে বিয়ের পর স্বামীর চাকরির সুবাদে বসবাস শুরু করেন কক্সবাজারে। মারিয়ার বাবা ছিলেন একজন শেফ বা রন্ধনশিল্পী। তাই ছোটবেলা থেকে রান্নার প্রতি একটা আগ্রহ জন্মে ছিল মারিয়ার মধ্যে। অবসরে রান্না নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। একসময় প্রতিবেশীরাও রান্নার বেশ প্রশংসা শুরু করেন। মাঝে মধ্যে প্রতিবেশীদের অফিসে দুপুরের খাবার তৈরির অর্ডার পেতেন। সেভাবেই শুরু তার যাত্রা। ২০১৯ সাল থেকে অনলাইনে ক্লাউড কিচেন বা ডেলিভারিভিত্তিক রান্নাঘর চালু করেন। এরপর ২০২২ সালে কক্সবাজারের লাবণী বিচ পয়েন্টে 'স্টারিনাস কিচেন' নামে রেস্টুরেন্ট খোলেন। ২০২২ সালে তার শাশুড়ির বন্ধু বিদেশ থেকে শুকনা সামুদ্রিক শৈবাল নিয়ে আসেন। সেখান থেকেই দেশে এই পণ্য তৈরির অনুপ্রেরণা পান উদ্যোক্তা মারিয়া রে। এরপর ইন্টারনেটে ঘেটে দেখেন রান্নায়ও এই শৈবাল ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে শৈবালে থাকা পুষ্টিগুণ তার আগ্রহ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। মারিয়া রে বলেন, কক্সবাজারের রাখাইন অধিবাসীদের মধ্যে গ্র্যাসেলেরিয়া প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। পরিচিত এক আত্মীয় রাখাইন সম্প্রদায়ের হওয়ায় স্থানীয় রাখাইনদের সঙ্গে তার মেশার সুযোগ হয়েছিল। সেখান থেকেই শৈবাল খাওয়ার অনেক প্রক্রিয়া জেনেছেন তিনি। 'উলভা' প্রজাতির শৈবাল বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে বেশ ভালোভাবে মানিয়ে যায়। তাই নিজের রেস্টুরেন্টে প্রথমে পাকোড়া, স্যুপসহ কিছু খাবারের সঙ্গে উলভা শৈবালের ফিউশন করা শুরু করি। উদ্যোক্তা হিসেবে মারিয়ার যাত্রাকে আরও সহজ করে দিয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। ব্যাংকটির পক্ষ থেকে 'আমরাই তারা'এর আওতায় বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেন মারিয়া। তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষণ আমার বিপণন দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করেছে। তাই আগের চেয়ে ব্যবসা আরও বড় করার স্বপ্ন দেখছি। **(সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো ১৬, জানুয়ারি ২০২৬)**

চিড়িয়াখানাকে আন্তর্জার্তিক মানে উন্নীত করতে কাজ করছে সরকারঃ প্রতিমন্ত্রী, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে কাজ করছে সরকার। গত ১ মার্চ রবিবার বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার জু রিসার্চ এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভে সেন্টারে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই এই চিড়িয়াখানাকে আরও সংগঠিতভাবে পরিচালনা করতে। এটি একটি সম্ভাবনাময় খাত। সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারলে চিড়িয়াখানাকে লাভজনক ও দর্শনার্থীবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমরা রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই না; রাষ্ট্রের সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চাই। মানুষ

আমাদের যে প্রত্যাশা নিয়ে নির্বাচিত করেছে, সেই আস্থা রক্ষা করাই আমাদের লক্ষ্য। শুধু আনুষ্ঠানিকতা পালন করে চলে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে আসিনি। চিড়িয়াখানা পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের

নির্দেশনায় তিনি চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে এসেছেন। জাতীয় চিড়িয়াখানাকে কীভাবে আন্তর্জাতিক মানের করা যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে বিনোদনের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। মানুষ ছুটি পেলেই কক্সবাজারসহ দেশ-বিদেশে চলে যান। তাই চিড়িয়াখানায় কোনো ত্রুটি বা অব্যবস্থাপনা রয়েছে কি না, তা দেখতেই আমরা আকস্মিক পরিদর্শনে এসেছি। চিড়িয়াখানায় অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন প্রাণীর খাঁচা, প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র ও ওষুধ সংরক্ষণাগার ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রাণীদের খাবার, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক পরিচর্যা বিষয়ে খোঁজখবর নেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. বয়জার রহমানের সভাপতিত্বে চিড়িয়াখানার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন পরিচালক ড. মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার। এসময় চিড়িয়াখানাটি আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তরের সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি উপস্থাপন করা হয়। পরিদর্শন-কালে কিউরেটর ডা. মো. আতিকুর রহমান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. কামরুজ্জামান, ফখরুদ্দিন আহামেদ, মুহাম্মদ শাহাদাত খন্দকার, ভেটেরিনারি সার্জন ডা. মো. ওয়ালিউর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্র: মো. মামুন হাসান (সিনিয়র তথ্য অফিসার) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)**

হাঁস পালন করে স্বাবলম্বী বুলবুলি

একসময় ছিলেন গৃহিণী। সংসারের কাজ শেষ করে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটত অবসরে। কিন্তু বসে থাকা তাঁর স্বভাবে ছিল না। অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রমই আজ বুলবুলি বেগমকে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিণত করেছে। অলস সময় কাজে লাগিয়ে হাঁস পালন করে বুলবুলি মাসে আয় করছেন ৭৫ হাজার টাকা। বুলবুলির বাড়ি রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে। উপজেলা সদর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে গ্রামটির কাঁচা-পাকা পথ ধরে যাওয়ার সময় অসংখ্য খামার চোখে পড়ে। প্রায় প্রতিটি বাড়ির আনাচকানাচ সবজি চাষ করা হয়েছে। বাড়ির পাশে খোলা জায়গায় সারি সারি হাঁসের খামার। সকালে পুকুর ও আশপাশের জলাশয়ে খাবারের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ে হাজারো হাঁস। ডিম সংগ্রহ ও পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত গ্রামের মানুষ। বুলবুলি বেগম জানান, ২০০১ সালে এসএসসি পাসের পর তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামীর সংসারে এসে দেখেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সীমিত আয়। সংসারের কাজ শেষ করার পর হাতে তেমন কোনো কাজ থাকত না। নিজের কিছু করার তাগিদ থেকেই হাঁস পালন শুরু করেন। তিনি বলেন, ২০১০ সালের শুরুতে পানবাজার গ্রামে ননদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ওই গ্রামের এক গৃহবধূর কাছে হাঁস পালনের কৌশল শেখেন। এরপর স্বামীর কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ির পাশে ঘর করেন। পরে ২০ হাজার টাকায় ৫০০ হাঁসের বাচ্চা কিনে খামার শুরু করেন। চার মাসের মধ্যে হাঁস ডিম দেওয়া শুরু করে। এক বছর ডিম বিক্রি করে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা আয় হয়। তার আয় দেখে স্বামীও তার সঙ্গে যোগ দেন। ডিম বিক্রির টাকায় আরও এক হাজার হাঁসের বাচ্চা কেনেন। এভাবে তিনি উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন। বর্তমানে বুলবুলির খামারে প্রায় তিন হাজার হাঁস আছে। হাঁসের ডিম ও হাঁস বিক্রি করে মাসে ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হচ্ছে। শুধু হাঁসের খামারই নয়, পরিবারের জন্য দুটি পুকুর খনন করেছেন। সেখানে মাছ চাষের পাশাপাশি কৃষিকাজও করছেন। পাশাপাশি একটি ছোট দোকান চালান। সব মিলিয়ে এখন স্বচ্ছলতা ফিরেছে সংসারে। দুজন শ্রমিক তার খামারে কাজ করেন। আয়ের টাকায় জমি কিনেছেন। বাড়ি পাকা করেছেন। এলাকার অনেকে এখন তার কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। বুলবুলি নিজের সংসারে সচ্ছলতা আনার পাশাপাশি গ্রামের অন্য গৃহবধূর নানা পরামর্শ দেন। তার দেখাদেখি ইকরচালী ইউনিয়নের অনেক গৃহবধূ হাঁস পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। শুধু নারীরা নন, গ্রামের অনেক বেকার তরুণও বুলবুলির দেখানো পথে হাঁস পালন করে বেকারত্ব ঘুচিয়েছেন। নবালাবাড়ি গ্রামের সাইফুল ইসলাম একসময় বেকার ছিলেন। ধারদেনা করে চলতেন। বাবার কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা নিয়ে ঘর তুলে ৪০০ হাঁসের বাচ্চা কিনে খামার শুরু করেন। বর্তমান তার খামারে এক হাজার হাঁস আছে। খামারের আয় দিয়ে তিনি ৬০ শতক জমি কিনেছেন। সাইফুল বলেন, হাঁস পালন করে তার সুদিন ফিরে এসেছে। বুলবুলি বেগমের পরামর্শে হাঁস পালন করে অনেকের সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে। হাঁসের খামার করে তার মতো আরও অনেকে দারিদ্র্যকে জয় করেছেন। বালাবাড়ি গ্রামের গৃহবধূ ছাবিয়া বেগম বলেন, 'দিনমজুর স্বামীর আয় দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর। এখন বুলবুলির খামারে কাজ করি, বাড়িতে ২০০ হাঁস পালি। এসব দিয়ে তেল-সাবানের খরচ হয়ে যায়। সংসারে কোনো ঝামেলা নাই। ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য তাজউদ্দিন বলেন, বুলবুলি শিক্ষিত ও পরিশ্রমী গৃহবধূ। তাঁর হাত ধরে ইউনিয়নের অনেকেই দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তারাগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ড. কে এম ইফতেখারুল ইসলাম বলেন, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস থাকলে যে সীমিত সুযোগ দিয়েও সফলতা অর্জন করা যায়, হাজীপাড়ার বুলবুলি বেগম তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখন তিনি শুধু একজন গৃহিণী নন, একজন সফল উদ্যোক্তা। এলাকার নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার নাম। **(সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০২৬)**

সমন্বিত কৃষির উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন হবেঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

কৃষির উন্নয়ন হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষি মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ। তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিএনপি কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিল। গত ২ মার্চ সোমবার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, মাঠ ও খামারের সঙ্গে তার সরাসরি সম্পৃক্ততাই কৃষির বাস্তব সমস্যাগুলোকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের (বার্ড)-এর জনক ড. আখতার হামিদ খান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষকরা কীভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেন, তা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখাতেন। সেই সময় থেকেই কৃষির আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন নিয়ে তাঁর মনে গভীর আগ্রহ ও পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। প্রধান অতিথি বলেন, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে কৃষি কার্ড চালু করা হবে। বর্তমানে দেশে কৃষকদের সঠিক ও সমন্বিত তথ্য ভাণ্ডারের অভাব রয়েছে। কৃষি কার্ড চালুর মাধ্যমে কৃষকদের প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, দেশে বিপুল পরিমাণ ঘাস উৎপাদন সত্ত্বেও পশুখাদ্যের দাম কেন বেশি তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। মাঠপর্যায় থেকে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বাস্তবসম্মত সমাধান গ্রহণ করা হবে, যাতে কৃষক ও খামারিরা ন্যায্য দামে পশুখাদ্য পেতে পারেন এবং উৎপাদন ব্যয় কমে আসে। প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও টেকসই করতে সরকার বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষি খাতের সার্বিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়তা দিতে সরকার ১০ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ মওকুফ করেছে, যা কৃষকদের আর্থিক চাপ কমিয়ে উৎপাদনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী কৃষি কার্ড চালুর বিষয়েও কাজ চলমান রয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে কৃষকদের সঠিক তথ্য ভাণ্ডার তৈরি এবং সরকারি সহায়তা কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। কর্মশালায় জানানো হয়, প্রাণিসম্পদ সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সারা দেশে মোট ৪৭৫টি এমভিসি (মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক) ক্রয় করা হয়েছে। এসব এমভিসি বর্তমানে দেশজুড়ে প্রায় সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রাণী চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের খামারিরাও দ্রুত চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা পাচ্ছেন। এছাড়া এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় লাইভস্টক ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল (এলএফএফএস), প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, টিকাদান, রোগ নজরদারি, কৃত্রিম প্রজনন এবং খামারি প্রোফাইলিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যাংক হিসাব খোলা ও সমবায় সঞ্চয়ের মাধ্যমে খামারিদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে, যা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৩৫টি ওয়েট মার্কেট নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৩টি জেলা শহরে আধুনিকমানের জেলা কসাইখানা (স্টার হাউজ) নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংস সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের সভাপতিত্ব করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক ড. মো. মোস্তফা কামাল, স্বাগত বক্তব্য ও মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। এ সময় মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান (সিনিয়র তথ্য অফিসার) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)**

সাটুরিয়ায় দুধের জোয়ার, ঘণ্টায় বিক্রি ৩০০ মণ

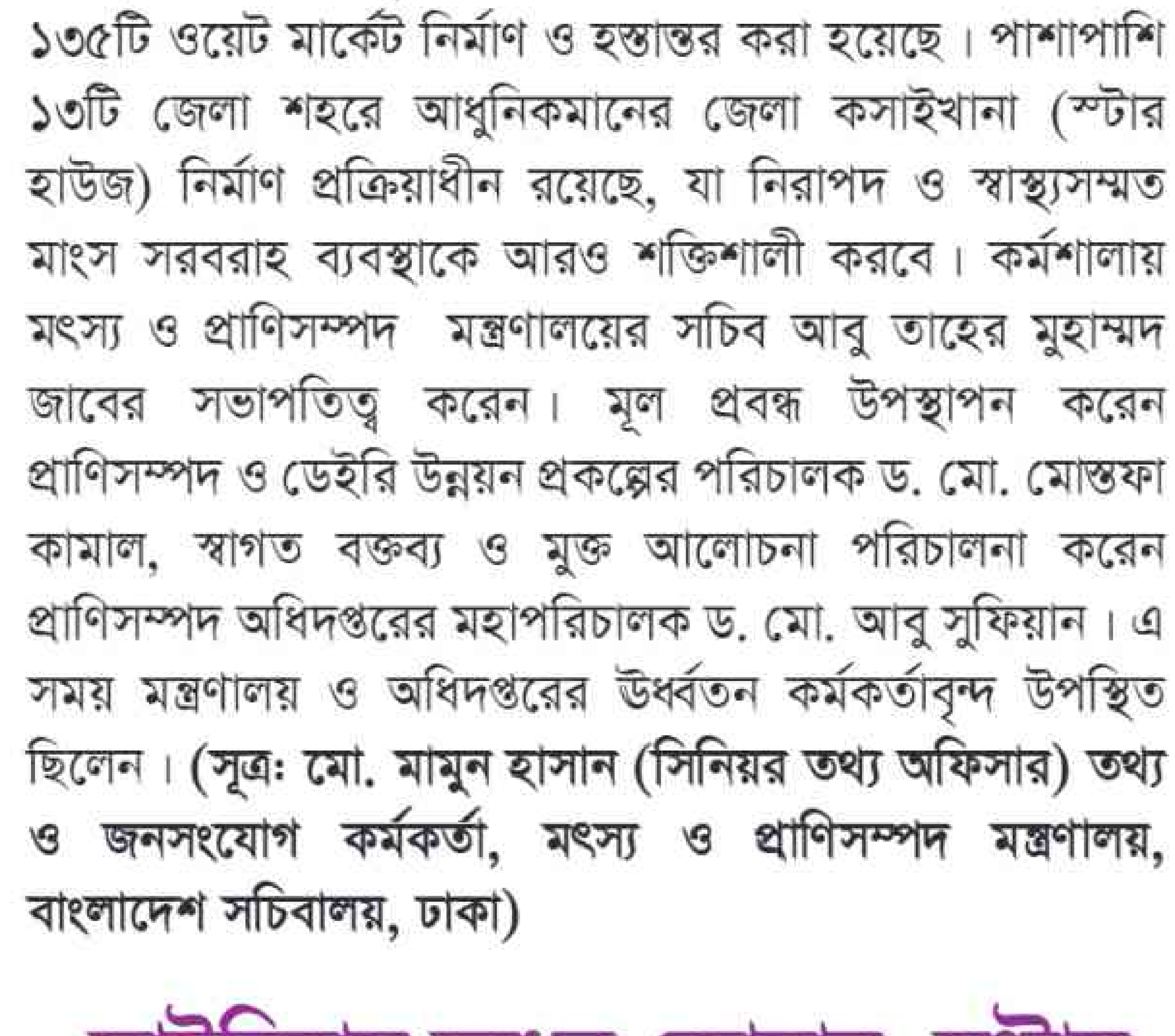

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গোপালপুর বাজারে প্রতিদিন সকালে বসে দুধের এক বিশাল হাট। মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে এই বাজারে প্রায় ৩০০ মণ দুধ বিক্রি হয়। চরাঞ্চল ও নদীবেষ্টিত এলাকা থেকে আসা ওই বাজারে দুধের গুণগত মান ভালো হওয়ায় দেশের ক্রেতা ও ঘোষদের চাহিদা মিটিয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাইকারদের প্রধান

আকর্ষণে পরিণত হয়েছে গোপালপুর বাজার। সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিমপাড়ের রাজৈর, বরাইদ, ছনকা, কাকরাইদ, নাটুয়াবাড়ি, গালা, কলিয়া, ধুলোটসহ আশপাশের গ্রামের খামারিরা দুধ বিক্রির জন্য খেয়া নৌকায় নদী পার হয়ে আসেন গোপালপুর বাজারে। অন্যদিকে নদীর পানি কমে যাওয়ায় কেউ কেউ দুধের কলস মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছেন। নদী পার হওয়ার পরে বেশ কিছু রাস্তায় তাদের দুধ ভর্তি সিলভারের কলস মাথায় নিয়ে হাঁটতে হয়। প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শতাধিক ক্ষুদ্র চাষি ও খামারিদের দুধ সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যেই চলে জমজমাট বেচাকেনা। দুধের গুণগত মান ভেদে দরদাম চলে প্রতি কেজি ৭০ থেকে ৯০ টাকায়। এ সময় পাইকারদের মধ্যে চলে দুধ কেনার প্রতিযোগিতা। এই হাটে প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ জন বড় পাইকার আসেন। কেউ এই দুধ সংগ্রহ করে সরাসরি ঢাকায় নিয়ে যান, আবার কেউ দুধ থেকে মাখন তৈরি করে তা রাজধানীর অভিজাত হোটেল ও বাজারে সরবরাহ করেন। স্থানীয়রা জানায়, ৮০ দশকের শুরুর দিকে গোপালপুর বাজারের আশপাশে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বাজার ছিল না। নিজেদের জমির ফসল ও গাভির দুধ বিক্রি করতে বিড়ম্বনায় পড়তে হতো কয়েক গ্রামের কৃষক ও খামারিদের। হাট বসানোর পরিকল্পনা নিয়ে ১৯৮৫ সালে বর্তমান বরাইদ ইউপি চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী মো. আব্দুল হাই গোপালপুর গ্রামে কিছু জমি কিনেন। পরে গ্রামের কৃষকেরা উৎপাদিত ফসল, দুধ ও কৃষি পণ্য সেখানে নিয়ে বিক্রি করা শুরু করে। ধীরে ধীরে কয়েক গ্রামের মানুষ ওই বাজারে পণ্য বেচাকেনা শুরু করেন। শুরুর দিকে গোপালপুর বাজারের আশপাশের মানুষ এসব দুধের ক্রেতা ছিলেন। নদীর ওপারের চরাঞ্চলে গবাদি পশুর জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক ঘাস পাওয়ায় সেখানকার দুধের ঘনত্ব ও স্বাদ অন্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশি। ব্যবসায়ীদের ধারণা প্রতিদিন এ বাজারে আট থেকে ১০ লাখ টাকার দুধ বেচাকেনা হয়ে থাকে। উপজেলার রাজৈর এলাকার দুধ বিক্রেতা কুলসুম মধ্য বয়স্ক এক গৃহবধু বলেন, 'তিনটা গাভী পালন করেই সংসার চলে। এ বাজারে প্রতিদিন ৩০০ মণের বেশি দুধ বিক্রি হয় বলে জানান তিনি। উপজেলার দরগ্রাম এলাকার পাইকারী দুধ ক্রেতা জীবন চন্দ্র ঘোষ বলেন, 'এ বাজারে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ মণ দুধ আসে। সাটুরিয়ার অন্যান্য বাজারে থেকে বিখ্যাত এবং সকালে হওয়ায় দুধের দাম বেশি দিয়ে অন্যান্য পাইকারদের সাথে প্রতিযোগিতা করে কিনতে হয়। প্রতিদিন প্রায় ২০ থেকে ২৫ মণ দুধ ক্রয় করি। যা বাড়িতে নিয়ে দুধের ছানা তৈরি করে ঢাকায় বিক্রি করি। এ বাজারের আশপাশের এলাকার প্রতিবাড়িতেই গাভী পালন করে। প্রচুর দুধ আসলেও বিক্রি হয় মাত্র এক ঘণ্টায়। তবে রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের বেহাল অবস্থার কারণে আরও খামারিরা আসতে পারে না। তারপরও প্রায় ৩০০ মণ দুধ বিক্রি হয়।' এ বিষয়ে সাটুরিয়া উপজেলা ভেটেরিনারী সার্জন ডা. মো. খোকন হোসেন বলেন, 'গোপালপুর বাজারের দুধের এই বিশাল সরবরাহ আমাদের স্থানীয় অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। বিশেষ করে চরাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা গরুর দুধ পুষ্টিগুণে অনন্য। আমরা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়মিত খামারিদের পরামর্শ দিচ্ছি, বিভিন্ন ফ্রি চিকিৎসা সেবা দিচ্ছি যাতে

দুধের পরিচ্ছন্নতা ও মান বজায় থাকে। খামারিরা যাতে দুধের সঠিক মূল্য পায় এবং দুধ সংরক্ষণের আধুনিক সুবিধা পায় সে লক্ষ্যেও আমরা কাজ করছি। তিনি আরও বলেন, 'সাটুরিয়ার এই দুগ্ধ উৎপাদন শুধু স্থানীয়দের স্বাবলম্বীই করছে না বরং রাজধানীর দুগ্ধ চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করছে।' **(সূত্রঃ দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা গত ২১ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান অতিথি হিসেবে ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাঁদেরসহ দেশের সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি সকল দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দকে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক যেসকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব, তার সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন,

করার সুযোগ রয়েছে। এরমধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ৫টি মৎস্য অধিদপ্তরের, ৫টি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এবং বাকি ৫টি মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে। কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ইশতেহার

অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, মো. আব্দুল জলিল। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর নির্বাচনী ইশতেহারে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নারীর ক্ষমতায়ণ, শূন্য পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং বিভিন্ন প্রকল্প ব্যয়ের রিয়েল টাইম মূল্যায়ন ও স্পষ্ট হিসাব ইত্যাদি। কর্মশালায় মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন। তিনি উল্লেখ করেন, মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত ছয় মাসে বাস্তবায়ন করা সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম কাজগুলো হলো, নতুন ৩৫টি অভয়াশ্রম স্থাপন, ৪০ হাজার নতুন জেলেকে খাদ্য সহায়তার আওতায় আনা, ১ হাজার ৩ শত ৭৫ জনকে বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতায় আনা ও ৮ হাজার ৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং মৎস্য আইন বাস্তবায়ন করা। তিনি আরও উল্লেখ করেন, আগামী ছয় মাসের লক্ষ্যমাত্রা তেলাপিয়া মাছের রেনু উৎপন্ন করা ৭.৮৩ লক্ষ কেজি, দেশীয় জাতের পোনা উৎপন্ন করা যাবে ৮১৫.৮ কেজি ও কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপন্ন করা যাবে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৮৪ কেজি। পাশাপাশি দেশের ২৯টি উপজেলায় অনলাইন ফিশ মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম চালু করা এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা মূল্যের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে নির্বাচন ইশতেহার অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ বজলুর রহমান। তিনি বলেন, অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী যে সকল কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ৩ কোটি ডোজ টিকা মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে ১০০টি গরু, ১৮৬০০টি ছাগল, ৪২৬টি ভেড়া, ২৫০০ হাঁস মুরগি বিতরণ করা এবং গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে প্রতিমাসে ৫ লক্ষ ডোজ উন্নত জাতের সিমেন মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা। তিনি আরও বলেন, চরাঞ্চলের ১৫০০ জন ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রতিমাসে প্রতি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে ৩০০ সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদানসহ প্রাথমিকভাবে ১৫০০ খামারির বীমা ব্যবস্থার পাইলটিং শুরু করা হবে। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে তৈরি করা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ১৫টি পয়েন্টের ভিত্তিতে আগামী ছয় মাসের কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নির্ধারণ করা হয়। কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ নিজস্ব প্রতিবেদক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)**

পোল্ট্রি ও ডেইরি ফার্ম থেকে বছরে আয় কোটি টাকা

পারিবারিক খামার থেকে পর্যায়ক্রমে বিশাল ডেইরি ও পোল্ট্রি খামার গড়ে তুলে বছরে আয় করছেন ২ কোটিরও অধিক টাকা। পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন এলাকার অসংখ্য নারী পুরুষেরা। শুরুটা করেছিলেন একদম পারিবারিক প্রয়োজনে স্বল্প পরিসরে। সদস্যদের সুষম ও আদর্শ খাদ্যের কথা চিন্তা করে তিনি, বাড়ির আঙিনার পাশে হাঁস, কবুতর ও মুরগির খামার গড়ে তুলেন। পরবর্তীতে পরিবারের বাড়তি আয়ের কথা চিন্তা করে ২০২০ সালের দিকে বাড়ির পাশে পতিত জায়গায় গড়ে তুলেন গরুর খামার। ২০টি গরু দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। তা আজ বিশাল কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এরপরে পর্যায়ক্রমে আলাদা শেড নির্মাণ করেন শুরু করেন লেয়ার মুরগির খামার। গাভীর দুধ বিক্রির পাশাপাশি সারা বছর বিক্রির জন্য ষাঁড়ও প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোরবানির হাটে বিক্রির জন্য আলাদা দেশীয় উন্নত জাতের ষাঁড় ও লালন পালন করে যাচ্ছেন। ডেইরি ফার্মের গোবর, লেয়ার খামারের বিষ্ঠা দিয়ে তিনি নিজ খরচে তৈরি করেছেন বিশাল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, সেখান থেকে নিজেদের ব্যবহার ছাড়া ও আশপাশের ৩০টি পরিবারের মাঝে বাণিজ্যিকভাবে এ গ্যাস সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া গ্যাস প্ল্যান্ট থেকে দুইটি জেনারেটর দিয়ে খামারের আলো বাতাসের ব্যবস্থাও গ্রহন করছেন। দেশীয় মুরগী, কবুতর, হাঁস এবং পোল্ট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ইত্যাদি ফার্ম থেকে বছরে প্রায় ২ কোটির অধিক টাকা আয় করে এলাকায় তাক লাগিয়ে

দিয়েছেন ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার সোনাপুর দীঘির পাড়ের উত্তর ধর্মপুর গ্রামের এইচ.এম. রহমান পোল্ট্রি এন্ড ডেইরি ফার্মের স্বত্বাধিকারী উদীয়মান শিল্প উদ্যোক্তা রাজিউল ইমাম মঞ্জিল। এলাকার লোকদের মুখে মুখে তাঁর নাম এখন "জিরো থেকে হিরো"। খামারের মালিক, স্থানীয় এলাকাবাসী, সংশ্লিষ্ট লোকজন ও সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, উদীয়মান শিল্পদ্যোক্তা রাজিউল ইমাম মঞ্জিল তাঁর অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নিজ গ্রামে পতিত জায়গায় পরিকল্পিত ভাবে বিশাল ডেইরি ও হাইলাইন ব্রাউন লেয়ার ফার্ম গড়ে তুলে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। দেশের বাড়তি খাদ্য জোগানে অনন্য অবদান রাখায় তিনি গত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের পক্ষ হতে দাগনভূঁঞা উপজেলার শ্রেষ্ঠ খামারির সনদও অর্জন করেন। পরিকল্পিতভাবে একই ভাউন্ডারি এলাকায় আলাদা শেড নির্মাণ করে দুধের গরু, ষাঁড়, গরুর বাছুর, কুরবানির গরু মিলিয়ে প্রায় ১০০ এর মতো গরু দিয়ে ডেইরি ফার্ম গড়ে তুলেছেন। সেখান থেকে প্রতিদিন সকাল-বিকাল প্রায় ৩০০ লিটার এর মতো দুধ আহরণ হয়। উক্ত দুধ গুলো প্যাকেটজাত করে উপজেলার বিভিন্ন বড় বড় হাট-বাজার ছাড়াও জেলা সদরে সরবরাহ করা হয়। অপর দিকে সুবিশাল ২টি শেডের মধ্যে ৫০০০ হাইলাইন ব্রাউন মুরগির খামার গড়ে তুলে সেখানে থেকে গড়ে প্রতিদিন ৩-৪ হাজার ডিম সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি মাংসের জোগানও দেয় এ খামারটি। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, কেউ মাঠ থেকে মাথা বোঁঝাই করে নেপিয়ার জাতের কাঁচা ঘাস মাথায় বোঁঝাই করে খামারে আনছেন, ডেইরি ফার্মে লতা পাইপের মাধ্যমে পানি দিয়ে পরিষ্কার করছেন, কেউ আবার ফার্মে পানি সাপ্লাই দিচ্ছেন, পাশের শেডে। ব্রাউন লেয়ার মুরগির খামারের খাদ্য খাওয়াচ্ছেন কেউ বা রড ও তারের তৈরি খাঁচা থেকে দুই হাত দিয়ে ডিম সংগ্রহ করে ক্যারটে ভরছেন। আর একটু পাশেই দেখা যাচ্ছে ক'জন শ্রমিক সংগ্রহিত দুধ বাজারজাত করার জন্য প্যাকেজিং এর কাজে ব্যস্ত। গেইটের সামনেই, অটো রিকসা, ভ্যান গাড়ি ও পিকআপ নিয়ে জটলা করছে দুধ ও ডিম সংগ্রহে আসা পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতারা। সব মিলিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ ও সার্বক্ষণিক লোকজনের কোলাহল চলছে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার উত্তর ধর্মপুর গ্রামের এইচ. রহমান পোল্ট্রি ও ডেইরি ফার্মকে ঘিরে। **(সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, ৬ জানুয়ারি ২০২৬)**

রমজানে ১০ লক্ষ পরিবারকে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস দেবে সরকারঃ প্রতিমন্ত্রী, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এর নেতৃত্বে জনগণের কল্যাণে কাজ করার প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সুলভ মূল্যে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য (দুধ, ডিম, ও মাংস) সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশে প্রায় ১০ লক্ষাধিক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং সাধারণ ভোক্তারাও উপকৃত হবেন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে মহাখালীস্থ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর সম্মেলন কক্ষে পবিত্র রমজান মাসে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জাতির কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতার মাধ্যমেই এ দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজান মাসে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে নিম্নআয়ের মানুষের কষ্ট বেড়ে যায়। নিম্ন আয়ের মানুষের কষ্ট লাঘবে সরকারের এ ধরণের উদ্যোগ তাদের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষি কার্ড ও হেলথ কার্ড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সততা, নিষ্ঠা ও সমন্বিত টিমওয়ার্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। তিনি বলেন, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জনগণের কল্যাণে কাজ করে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নিজে কষ্ট ভোগ করেছেন কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের (**সূত্র: মো. মামুন হাসান (সিনিয়র তথ্য অফিসার) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিবের তথ্য দপ্তর পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর পরিদর্শন করেন ও মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২১ জানুয়ারি (বুধবার) সকাল ৯ টায় তথ্য দপ্তর পরিদর্শন শেষে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, মো. ইমাম উদ্দীন কবীর, যুগ্ম সচিব, আহমদ সাইফুল ইসলাম ও সচিবের একান্ত সচিব, মোহাম্মদ ইয়ামিন হোসেন। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ও অনুষ্ঠান

সঞ্চালনা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের উপপরিচালক (উপসচিব) উম্মে হাবিবা। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব বলেন, তথ্য দপ্তরকে এগিয়ে নিতে হলে এ দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে আরও ক্রিয়েটিভ কিছু পদ সৃষ্টি করতে হবে । তিনি আরও বলেন, দপ্তরের নিজস্ব ভবন, জনবল সংকটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর সমাধান করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। **(সূত্র: নিজস্ব প্রতিবেদক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর)**

নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি বলেছেন, নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী দেশের প্রান্তিক খামারি ও উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। ৯ মার্চ সোমবার বিকেলে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বাণিজ্যিকভাবে মহিষ পালনে উদ্যোক্তা উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিখাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা, উপজেলা পর্যায়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও মানসম্মত চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, পোলট্রি ও ডেইরি খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে সহজলভ্য করা এবং এ খাতকে একটি শিল্পে পরিণত করাই সরকারের লক্ষ্য। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা এবং ভ্যাকসিন কর্মসূচি জোরদারের মাধ্যমে প্রান্তিক খামারিদের সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে সরকার। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রোটিন চাহিদাপূরণে পোল্টি ও ডেইরি খাতের পাশাপাশি মহিষ পালন সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মহিষের মাংস পুষ্টিকর এবং দুধ উৎপাদনেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণে মহিষ পালনে উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গরুর তুলনায় মহিষ দুধ উৎপাদনে অধিক সক্ষম হওয়ায় মহিষের সংখ্যা ও খামারি বাড়াতে হবে এবং এ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন এবং খামারিদের সহায়তা দিতে সরকার ইতোমধ্যে কৃষক ও খামারিদের মধ্যে ফার্মার্স কার্ড বিতরণের কার্যক্রম শুরু করছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারিদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হলে ভবিষ্যতে তাদের বিভিন্ন সরকারি সহায়তা প্রদান সহজ হবে এবং খামারের পরিধি বাড়িয়ে তারা

দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন। তিনি বলেন, গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা এবং এ খাতে পর্যাপ্ত বাজেট নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক এ প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও খামরিরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রতিমন্ত্রী ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দেশে মহিষ পালন ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধ ও মাংস উৎপাদনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করা সম্ভব। তিনি বলেন, প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোতে দুধ উৎপাদনের একটি বড় উৎস মহিষ হলেও বাংলাদেশ এ খাতে এখনো পিছিয়ে আছে। তাই উন্নত জাতের মহিষ সংগ্রহ, বাছুর খামারিদের মধ্যে বিতরণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিষ পালন সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় দুই ব্যাচে দেশের বিভিন্ন জেলা হতে আগত ১০০ জন খামারি ও উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণে মহিষ পালনে বিএলআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, মহিষ পালনে খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধে করণীয়, চাষ ও সংরক্ষণ, মহিষের প্রজনন ব্যবস্থাপনা, খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ প্রশিক্ষণার্থীগণকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান (সিনিয়র তথ্য অফিসার) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)**

মাছ চাষে অ্যাকোয়া-ড্রাগসের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে করণীয়

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে মৎস্য খাতের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা-পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান প্রায় ২.৫৩ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রায় ২২.২৬ শতাংশেরও বেশি। প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। পাশাপাশি দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই খাতের উপর নির্ভরশীল। প্রতিবছর মৎস্য খাতে অতিরিক্ত ৬ লক্ষাধিক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষের জীবিকার উৎস এই খাত। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ মাছ উৎপাদনকারী দেশ। বিশেষ করে গত দুই দশকে মিঠা পানির মাছচাষ যেমন কার্প, তেলাপিয়া, শিং, মাগুর, গুলশা, পাবদা ও পাঙ্গাসসহ অন্যান্য প্রজাতির অধিক ঘনত্বের চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। অধিক ঘনত্বের মাছচাষের ক্ষেত্রে পানির গুণাগুণ বজায় রাখতে চাষীদের জন্য ড্রাগস ও বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার দিন দিন অপরিহার্য হয়ে উঠছে। বর্তমানে মাছচাষে জীবাণুনাশক, পরজীবীনাশক, প্রোবায়োটিক এবং অ্যান্টিবায়োটিকসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষিদের সঠিক রোগ নির্ণয়, উপযুক্ত ডোজ নির্ধারণ এবং প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকার কারণে এসব ড্রাগস ও রাসায়নিকের অপব্যবহার হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এসব পণ্য মূলত দেশীয় কোম্পানিগুলো বাজারজাত করে এবং বর্তমানে ১০০টিরও বেশি কোম্পানির প্রায় ৪০০টিরও বেশি অ্যাকোয়া-ড্রাগস ও রাসায়নিকের ফর্মুলেশন সরবরাহ করছে। তবে এসব পণ্যের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা ছাড়াই হচ্ছে, যা নিরাপত্তা ও পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। বিশেষত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলসহ সারা দেশের মাছ ও চিংড়ি চাষিরা মৎস্য কর্মকর্তাদের পরিবর্তে ওষুধ বিক্রেতা বা কোম্পানির প্রতিনিধিদের পরামর্শে ড্রাগ ব্যবহার করে থাকেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একোয়া-ড্রাগস ব্যবহারে পুকুরের উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়ে জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়, পানির স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়, তলানির গুণমান খারাপ হয় এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। পাশাপাশি নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কারণে অ্যাকোয়াকালচারে এ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাছের শরীরে থাকা অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ খাবারের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে হরমোনাল ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, শিশুর বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে কিডনি ও লিভারের জটিলতা বাড়াতে পারে। বিশ্বব্যাপী অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সকে বর্তমানে একটি 'নীরব ঘাতক' হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, যার একটি বড় উৎস হলো কৃষি ও মৎস্যখাতে অতিরিক্ত ড্রাগ-নির্ভরতা। এছাড়া নিয়ন্ত্রণহীন রাসায়নিকের ব্যবহার খাদ্য নিরাপত্তাকে তিনভাবে বিপদে ফেলছে, প্রথমত মাছের শরীরে ক্ষতিকর উপাদান বৃদ্ধি পেয়ে ফিশ ফুড সেফটি কমে যায়, দ্বিতীয়ত পানির গুণমান নষ্ট হয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তৃতীয়ত বাজারে আস্থা কমে গিয়ে বিদেশে রপ্তানি সীমিত হয়, যা অর্থনৈতিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যথাযথ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ না থাকলে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তার বড় সংকট তৈরি হতে পারে। আরেকটি বড় সমস্যা হলো মিঠা পানির মৎস্যচাষে অ্যাকোয়া-ড্রাগস ব্যবহারের জাতীয় পর্যায়ের তথ্য ও পর্যবেক্ষণের অভাব। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো বেশিরভাগই নির্দিষ্ট অঞ্চল বা উপকূলীয় চিংড়ি চাষ কেন্দ্রিক ছিল। কার্প, তেলাপিয়া ও ক্যাটফিশের মতো পুকুর ভিত্তিক চাষে কী ধরনের ড্রাগ ব্যবহৃত হচ্ছে, কত পরিমাণে এবং কত ঘনঘন প্রয়োগ করা হচ্ছে এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও সীমিত। ফলে জাতীয় জলজ প্রাণী স্বাস্থ্যবিধি ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে বর্তমান ব্যবহারের সামঞ্জস্য নির্ধারণ করা কঠিন। স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে জাতীয় পর্যায়ে মাছ চাষে ব্যবহৃত ড্রাগের নিয়মিত মনিটরিং ও ডেটাবেস তৈরি, কোম্পানিগুলোর পণ্যের

গুণমান ও নিরাপত্তা পরীক্ষায় নজরদারি জোরদার, মাছ চাষিকে সঠিক ডোজ ও বায়োসিকিউরিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, অ্যান্টিবায়োটিকের বদলে প্রোবায়োটিক, প্রিবায়োটিক ও পোস্টবায়োটিকের ব্যবহার, রোগ প্রতিরোধে টিকাদান, উত্তম মৎস্য চাষ ও উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার মতো বিকল্প পদ্ধতির প্রচলন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার সুবিধা বৃদ্ধি এবং ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। বাণিজ্যিক মিঠা পানির মৎস্যচাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়া এবং রাসায়নিক নির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরতা বাড়ার প্রেক্ষাপটে, বর্তমান ব্যবহারের ধরন মূল্যায়ন ও সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে অ্যাকোয়া-ড্রাগস ও রাসায়নিকের ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বেসলাইন তথ্য এবং মাছ চাষিদের সচেতনতার মাত্রা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উৎস ও প্রয়োগ পদ্ধতির জ্ঞান ঘাটতি চিহ্নিত করা এখন সময়ের দাবী। সবশেষে বলা যায়, অ্যাকোয়া-ড্রাগস নিঃসন্দেহ মৎস্যচাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও এর অজ্ঞতাপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। তাই

চিত্র: মাছ চাষে প্রচলিত অ্যাকোয়া-ড্রাগস

জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর নীতিমালা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মনিটরিং এবং সচেতনতার সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ও টেকসই মৎস্যচাষ নিশ্চিত করাই হতে পারে ভবিষ্যত সুরক্ষার প্রধান চাবিকাঠি।

লেখক: ১. আসমা জামান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি কেন্দ্র, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট।

২. ড. মো. সিরাজুম মনির, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সদরদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট।

৩. ফারজানা জান্নাত আঁখি, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, স্বাদুপানি কেন্দ্র, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট।

"সঠিক উপায়ে অ্যাকোয়া ড্রাগস ব্যবহার করি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করি"

মৎস্য খামারি খাইরুল আমিন এর সফলতার গল্প

খাইরুল আমিন লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার একজন বাসিন্দা। খুব অল্প বয়স থেকে নিজেদের পারিবারিক আমিষের চাহিদা মেটানোর জন্য সর্বপ্রথম মাছ চাষ শুরু করেন। পরবর্তীতে খাইরুল আমিন বলেন, তিনি ২০১৮ সালে তার নিজস্ব দুটি পুকুরে মাছ চাষ করেন, মাছ চাষে মোটামুটি লাভের মুখ দেখায় পাশ্ববর্তী এলাকায় ৮০ শতাংশের একটি জলাশয় লিজ নিয়ে মাছ চাষের পরিধি আরও বৃদ্ধি করেন। খাইরুল আমিন বলেন, বর্তমানে তিনি কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ করছেন অর্থাৎ তার জলাশয়ে রুই, কাতলা, মৃগেল ,কালিবাউস, সিলভার কার্প ও তেলাপিয়া প্রজাতির মাছ রয়েছে। খাবার বিষয়ে জানতে চাইলে খাইরুল আমিন জানান মাছের খাবার তিনি নিজ হাতে তৈরি করেন। বিভিন্ন উপাদান যেমন ভুসি, কুড়া, খৈল, ভাতের মাড় ইত্যাদি মিশিয়ে মাছকে খাদ্য হিসাবে সকালে ও বিকালে প্রদান করেন। তাছাড়া খাইরুল প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসপি ব্যবহার করে থাকেন। শ্রমিকের বিষয় ও মাছের পোনা সংগ্রহের বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, তিনি নিজেই একজন মৎস্য খামারি সেজন্য তিনি নিজেই তার পুকুর দেখাশোনা করা, পুকুরে খাবার প্রয়োগ এই কাজগুলো করে থাকেন। মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পোনা সংগ্রহ করেন। মাছ বিক্রির বিষয়ে খাইরুল বলেন, তার খামারের মাছ স্থানীয় হায়দারগঞ্জ মাছ বাজার ও রায়পুর এর বিভিন্ন মাছের বাজারে বিক্রি করেন। তার পুকুরের উৎপাদিত মাছ বিক্রি করে ভালো লাভবান হয়েছেন। খাইরুল আলম আরও বলেন মাছ চাষের আয় থেকে ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালানো এবং সংসারের ব্যয়ভার এই খামারের আয়ের অর্থ দিয়ে মিটিয়ে থাকেন। মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন মাছ চাষের উপর কোন ধরনের প্রশিক্ষণ নেননি। এ সময় খাইরুল আলমকে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। তরুণ উদ্যোক্তাদের বিষয়ে খাইরুল জানান মাছ চাষ একটি লাভজনক পেশা। বিভিন্ন পেশায় থাকা অবস্থায়ও পাশাপাশি মাছ চাষ করা যায়। যুবক যারা আছে তারা বেকার না থেকে মাছ চাষ করে পারিবারিক আমিষের চাহিদা

পূরণের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও স্বাবলম্বী হতে পারবেন। এজন্য তিনি তরুণ উদ্যোক্তাদের মাছ চাষে এগিয়ে আসার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে খাইরুল আমিনকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষ বিষয়ক দেশি কৈ মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা, অ্যাকোরিয়ামে মাছ পালন পদ্ধতি,কালিবাউস মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন, গুতুম মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন, মাহাশোল মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা, গনিয়া মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, গুজি আইড় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মুদ্রণ সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। **(প্রতিবেদকঃ মো. আল আমিন, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা)**

সায়েন্টিফিক উপায়ে ঘাস চাষ এর মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানো সম্ভব-সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বর্তমান সময়ে কার্বন নিঃসরণ ও গবাদি পশু পালন একটি আলোচিত বিষয়, সায়েন্টিফিক উপায়ে ঘাস চাষ ও সরবরাহ করার মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ পরিমান কমানো সম্ভব। গত ০৮ ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখ "কার্বন নিঃসরণরোধী পশুখাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল মহিষ পালন সম্প্রসারণ প্রকল্প" কর্তৃক আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) গাজী মো. ওয়ালি-উল-হক। তিনি বলেন, কপ-৩০ সম্মেলনে কার্বন নিঃসরণ ও গবাদি পশু পালন এর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় ৫০ জন কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১০০ জন স্টাফকে আধুনিক পশুখাদ্য উৎপাদন, ঘাস চাষের উন্নত কৌশল, পরিবেশবান্ধব খামার ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি সম্পর্কে হাতে-কলমে ধারণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৪,২৫০ জন সুফলভোগীর প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৪,২৫০ জন খামারির মধ্যে ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক, উন্নত ঘাসের কাটিং এবং ডালের বীজ সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোঃ বয়জার রহমান, বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির পরিচালক ড. হুমায়ুন কবির এবং প্রকল্প পরিচালক ও থেরিওজেনোলজিস্ট ড. মোছা. সুমনা আক্তার। **(সূত্রঃ নিজস্ব প্রতিবেদক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ত্য দপ্তর)**

বেকারত্বের জাল ছিঁড়ে গাড়ল খামারে স্বাবলম্বী ওয়াসিম

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় বেকারত্বের হতাশাকে পেছনে ফেলে নিজের মাটিতেই সফলতার গল্প লিখেছেন নস্তি গ্রামের তরুণ মো. ওয়াসিম মন্ডল (২৫)। গরিব কৃষক পরিবারে জন্ম নেয়া ওয়াসিম একসময় পরের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে সংসারের অভাব সামলাতেন। চাকরির পেছনে না ছুটে নিজ উদ্যোগে কিছু করার স্বপ্ন থেকেই শুরু করেন ভেড়া ও গাড়ল পালনের পথচলা। আজ তিনি এলাকায় একজন পরিচিত ও সফল খামারি। কৃষি প্রধান এই অঞ্চলে যখন অনেক তরুণ কাজের অভাবে দিশেহারা, তখন ওয়াসিম নিজ উদ্যোগে উন্নত জাতের গাড়ল এনে গড়ে তুলেছেন একটি সম্ভাবনাময় খামার। বাবা মো. রবিউল মন্ডলের একমাত্র সন্তান ওয়াসিম প্রথমে ভারতের রাজস্থান অঞ্চলের গাড়ল সম্পর্কে জানতে পারেন। পরে চুয়াডাঙ্গার শিয়ালমারি হাট থেকে পাঁচটি গাড়ল কিনে খামার শুরু করেন। সময়ের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে গাড়ল সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে খামার বড় করেন তিনি। বর্তমানে তার খামারে প্রায় ২৪টি ছোট-বড় গাড়ল রয়েছে। খামার থেকেই সরাসরি বিক্রি হচ্ছে গাড়ল ও ভেড়া। প্রকারভেদে এসব গাড়লের দাম ১৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত। পূর্ণবয়স্ক গাড়লের দাম ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা এবং ৩ থেকে ৪ মাস বয়সী বাচ্চার দাম ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা। স্থানীয় লোকজন ও আশপাশের ব্যবসায়ীরা

সরাসরি খামার থেকেই পশু কিনে নিচ্ছেন। বিশেষ করে কোরবানির মৌসুমে চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে। ওয়াসিম জানান, গাড়লের মাংস ভেড়া বা ছাগলের তুলনায় বেশি সুস্বাদু এবং একটি গাড়ল থেকে ৩০ থেকে ৪০ কেজি পর্যন্ত মাংস পাওয়া যায়। কম খরচে ভালো লাভ হওয়ায় এই খাতে তিনি আশাবাদী। তার খামার দেখে এলাকায় অনেক বেকার যুবক ভেড়া ও গাড়ল পালনে আগ্রহী হচ্ছেন। ইতোমধ্যে স্থানীয় খামারি মো. সজীব মোল্লা ও আলী হোসেনও এই খাতে যুক্ত হয়েছেন। ওয়াসিমের বাবা মো. রবিউল মন্ডল বলেন, ছেলে পরের পেছনে না ছুটে নিজে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই আজ এই সাফল্য এসেছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকেও বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তা ডা. মো. নুর আলম বলেন, কম খরচে ও কম ঝুঁকিতে গাড়ল পালন একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ। সঠিক পরিচর্যা ও নিয়মিত টিকাদান নিশ্চিত করলে এই খাতে ভালো সাফল্য পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে ওয়াসিম নিজে, তার স্ত্রী ও বাবা খামারের দেখাশোনা করছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিকও কাজ করছে। ঘাস, লতাপাতা, খড় ও ভুসি প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আসন্ন কোরবানির মৌসুমে ভালো লাভের আশায় ভবিষ্যতে দুম্বা পালনের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। ওয়াসিমের এই সাফল্য শুধু তার পরিবারের মুখে হাসি ফেরায়নি, মহেশপুর জুড়ে নতুন করে ভেড়া ও গাড়ল খামারের সম্ভাবনাও দেখাচ্ছে এবং গ্রামের তরুণদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন জাগাচ্ছে। **(সূত্রঃ দৈনিক আজকের বাংলাদেশ, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬)**

মাছ নিয়ে ফারজানার সফল উদ্যোগ, এখন কর্মী ৭০

কিশোরগঞ্জের ভৈরব কিংবা চট্টগ্রামের ফিশারিঘাট মাছের আড়ত। রাত ৩টা থেকে ৪টার দিকে যখন কর্মচাঞ্চল্য তুঙ্গে, তখন সেখানে ভিড়ের মধ্যে দেখা মিলল এক নারীর। কাঁদা-পানির মাখামাখি আর হাজারো পুরুষের ভিড়ে তিনি মাছ চিনছেন, শিখছেন মাছ সংরক্ষণের কায়দা। তিনি ফারজানা আকতার । একসময় করতেন টেলিভিশন সাংবাদিকতা, আর এখন তিনি সফল উদ্যোক্তা। ফারজানা একা শুরু করেছিলেন ২০১৯ সালে, এখন তাঁর প্রতিষ্ঠানে ৭০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। রাজধানীর হাতিরঝিল সংলগ্ন এলাকায় রিভার ফিশের কার্যালয়ে কথা হয় ফারজানা আকতারের সঙ্গে। ফারজানা আকতারের বড় হয়ে ওঠা কুমিল্লায়। ১৯৯৭ সালে খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারান তিনি। মা আর ছোট বোনকে নিয়ে শুরু হয় এক কঠিন জীবনযুদ্ধ। সংসারের হাল ধরতে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন ৩০০ টাকা বেতনে শুরু করেন টিউশনি। পড়াশোনার পাশাপাশি কখনো এনজিওতে কাজ করেছেন, কখনো কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়িয়েছেন, আবার কখনো দর্জির কাজ করে চালিয়েছেন সংসারের চাকা। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশোনা থামাননি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ থেকে সমাজকর্মে উচ্চশিক্ষা শেষ করে ২০১৪ সালে আসেন ঢাকায়। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর টেলিভিশন সাংবাদিকতার নতুন অধ্যায়। টেলিভিশন সাংবাদিকতা বাইরের মানুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হলেও, ঢাকার আকাশছোঁয়া ব্যয়ের জীবনে টিকে থাকা ফারজানার জন্য ছিল এক নীরব সংগ্রাম। বাড়তি আয়ের আশায় ২০১৮ সালে 'টুশিস কিচেন' নামে ফুডপান্ডার মাধ্যমে খাবার সরবরাহ শুরু করেন তিনি। এরপর 'ফেরিওয়ালা' নামে একটি অনলাইন পেজ খুলেন সাংবাদিকতা করার সময় ফারজানা দীর্ঘদিন নদী দখল ও দূষণ নিয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করেছেন। এই কাজের সূত্রেই তিনি গভীরভাবে খেয়াল করেন, রাজধানীর বাজারে সাধারণ মানুষের জন্য ফরমালিনমুক্ত এবং নদীর তাজা মাছ পাওয়া কতটা দুঃসাধ্য। তিনি লক্ষ করেন, মূলত সঠিক সংরক্ষণের অভাব ও বিক্রেতাদের অসচেতনতার কারণে মাছের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। নাগরিক জীবনের এই বড় সংকটকেই তিনি নিজের নতুন সম্ভাবনায় রূপ দেন। বাজারব্যবস্থার এই ফাঁকটুকু পূরণ করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৯ সালের মার্চে শুরু করেন মাছ নিয়ে তাঁর স্বপ্নের উদ্যোগ।

সফটওয়্যার প্রকৌশলী স্বামী যখন পাশে বাঙালির চিরন্তন পরিচয় 'মাছে-ভাতে বাঙালি' ঐতিহ্যকে ডিজিটাল যুগে আরও সহজলভ্য করে তুলছেন এই দম্পতি। ব্যস্ত নাগরিক জীবনে নদী বা হাওরের টাটকা মাছ খুঁজে পাওয়া যখন দুষ্কর, তখন সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরাসরি জলাশয়ের মাছ পৌঁছে দিতে কাজ করছেন ফারজানা আকতার ও তাঁর স্বামী সফটওয়্যার প্রকৌশলী তানভীর আজাদ। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে অনলাইন মাধ্যম 'রিভার ফিশ'। শুরু থেকেই ফারজানার উদ্যোগের সঙ্গে ছায়ার মতো ছিলেন তানভীর আজাদ। ফারজানা ঘুরে বেড়ান দেশের বিভিন্ন জেলায়, পরিচয় করিয়ে দেন বিল ও নদীর বিলুপ্তপ্রায় সব দেশি মাছের সঙ্গে। আর সেই মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করেন তানভীর। তানভীর আজাদ বলেন, 'আমরা মূলত নদী, হাওর, বিল এবং সমুদ্রের প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা মাছ সংগ্রহ করি। আমাদের লক্ষ্য হলো মাছের কৃত্রিমতা দূর করে একদম টাটকা স্বাদ গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।' তাদের সংগ্রহে রয়েছে হাওরের মাছ, ধনু নদীর পাঁচমিশালি মাছ, বাতাসি, গুতুম, বিলের দেশি কই, মাগুর ও শোল। নদীর কাজলি, মধু টেংরা, পাবদা এবং বড় আকারের কাতল, কোরাল। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে আছে কাপ্তাই লেকের পাবদা, হাকালুকি হাওরের বড় মাছ, সুনামগঞ্জের কালো চিংড়ি, প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা গলদা ও ডিমা চিংড়ি। মাঝরাতে আড়তে ব্যবসা শুরুর আগে ফারজানা একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নেন–তাঁকে আগে মাছ চিনতে হবে। এই সংকল্প থেকে টানা তিন মাস তিনি গভীর রাতে চষে বেড়িয়েছেন রাজধানীর কারওয়ান বাজার কিংবা যাত্রাবাড়ীর বড় বড় মাছের আড়তে। একজন নারীর জন্য রাত ২টা বা ৪টার দিকে ওই পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশে যাওয়াটা ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা ছিল একেবারেই ভিন্ন ও ইতিবাচক। সেখানকার তথাকথিত 'অশি-ক্ষিত' শ্রমিক ও মহাজনেরা তাকে দেখে কটু কথা বলা তো দূরের কথা বরং পরম মমতায় মাছ চিনতে সাহায্য করেছেন। ফারজানা আকতার স্মৃতিচারণা করে বলেন, 'আমাকে দেখে আড়তদারেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেন আপা, এত রাতে এখানে কী করেন? আমি যখন বলতাম মাছের ব্যবসা করার জন্য মাছ চিনতে এসেছি, তারা দারুণ উৎসাহ দেখাতেন। বলতেন, আসেন আপা আপনাকে মাছ দেখাই। কাঁদা-পানিতে মাখামাখি সেই ভিড়েও কেউ আমাকে ধাক্কা পর্যন্ত দিত না। উল্টো মহাজনেরা যত্ন করে শিখিয়ে দিতেন কোন মাছ কোন জেলা বা কোন নদী থেকে এসেছে।' সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা যখন ব্যবসায়িক কৌশল একজন দক্ষ সাংবাদিকের গবেষণার অভ্যাসকে ফারজানা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর ব্যবসায়। মাছের সঠিক উৎস নিশ্চিত করতে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ করতেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে। এমনকি কোনো নির্দিষ্ট মাছ কোন জনপদে ভালো পাওয়া যায়, তা জানতে সাহায্য নিয়েছেন বাংলাপিডিয়ারও। মাছ যেন ঢাকায় আনার পথে গুণগত মান না হারায়, সে জন্য জেলেদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন প্যাকিংয়ের বিশেষ কৌশল। মাছের খোঁজে তিনি ছুটে গিয়েছেন দেশের নানা জেলার নদী, খাল আর বিলের পাড়ে। সাফল্যের জয়গান শুরুর পথটা ফারজানা পাড়ি দিয়েছেন একদম একা। সারা দিন অফিস করে রাতে নিজেই ক্রেতাদের বার্তার উত্তর দিতেন। ২০১৯ সালের আগস্টে মাত্র দুই জন কর্মী নিয়ে শুরু হওয়া সেই ছোট উদ্যোগটি আজ ডালপালা মেলে বিশাল মহিরুহে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন ৭০ জন কর্মী। ২০২০ সালে করোনা মহামারির কঠিন সময়ে যখন চারদিকে কর্মসংস্থানের সংকট, তখন ফারজানা সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। সাংবাদিকতার পেশা ছেড়ে পূর্ণকালীন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন নিজের প্রতিষ্ঠান 'রিভার ফিশ'-এ। তারা গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী মাছ ঐতিহ্যবাহী বাঙালি স্বাদে ভেজে এমনভাবে প্যাকিং করে দেয়, যা প্রবাসীরা সহজেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন। এ ছাড়া তারা বিমানবন্দরে সরবরাহের সুবিধাও প্রদান করে থাকে। শুধু মাছই নয়, রিভার ফিশে পাওয়া যাচ্ছে গ্রামের দেশি মুরগি, হাঁস এবং প্রি-অর্ডারের মাধ্যমে খাসির মাংস। যারা শুঁটকিপ্রেমী, তাদের জন্য রয়েছে কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত চ্যাপা শুঁটকি, নিরাপদ ছুরি ও লইট্টা শুঁটকি ইত্যাদি। ফারজানা আকতার বলেন, 'নিজেকে কেবল "নারী" ভাবলে চলবে না, ভাবতে হবে মানুষ হিসেবে। জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাস থাকলে সব বাধা জয় করা সম্ভব।' ফারজানার এই দীর্ঘ সংগ্রামের গল্প আর রিভার ফিশের সাফল্য এখন অসংখ্য নারীর জন্য সাহসের উৎস। বর্তমানে তিনি নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করছেন; প্রশিক্ষণ আর ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলাই এখন তার লক্ষ্য। **(সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)**

**"মাছ খেলে বাড়ে বল
সুস্থ থাকবে মনোবল"**

জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার

দেশের জাতীয় মাছ ইলিশ শুধু দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক নয়, বরং অর্থনীতি ও পুষ্টির ক্ষেত্রেও অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। ইলিশ মূলত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তেঁতুলিয়া, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি নদীতে প্রজনন ও বংশবিস্তার করে। সাগর থেকে নদীতে এসে ডিম ছাড়ে এবং পরবর্তীতে জাটকা (ইলিশের পোনা) নদীতে বেড়ে ওঠে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ (প্রায় ১২%) এবং জিডিপিতে অবদান এক শতাংশ। বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮০ শতাংশের বেশি আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী থেকে। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে, ইলিশের ডিমের অর্ধেক যদি নিষিক্ত হয় এবং তার মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ বেঁচে থাকে, তাহলে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি পোনা ইলিশ জন্ম নিতে পারে। ইলিশের ডিম পাড়ার মৌসুম শেষ হলেও ছোট ইলিশের বৃদ্ধি হওয়ার জন্য কিছু সময় থাকে। তাই জাটকা ধরা দীর্ঘ সময় বন্ধ রাখলে ইলিশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মা ইলিশকে রক্ষা করলে তারা ডিম পাড়ার সুযোগ পায় এবং সেই ডিম থেকে জন্ম নেয়া জাটকা পরবর্তীতে বড় ইলিশে পরিণত হয়। একটি মা ইলিশ সাধারণত চার থেকে পাঁচ লাখ ডিম দেয়। মা ইলিশ দেশের নদী ও নদীর মোহনায় ডিম ছাড়লেও এই ডিম থেকে ইলিশ সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ কোনো পরিচর্যা ছাড়াই ইলিশ দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং সাগর ও নদীর বিশাল জলরাশিকে পরিপূর্ণ করে। সাধারণত মাঝ অক্টোবরে, যখন সাগর ও নদীর পানি উত্তাল থাকে, তখন মা ইলিশ পদ্মা ও মেঘনার দিকে ডিম ছাড়ার জন্য আসে। এই সময় মা ইলিশ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিলে নদীর জলরাশি ইলিশের ডিমে পরিপূর্ণ হয়। প্রায় ৫ থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে, বিশেষ করে আশ্বিন মাসের ভরা পূর্ণিমার পাঁচ দিন আগে ও পরে, মা ইলিশ সাগরের গভীর থেকে মিঠা পানিতে নির্দিষ্ট এলাকায় জড়ো হয় এবং পুরুষ মাছও তাকে অনুসরণ করে। **ইলিশের কৃত্রিম প্রজনন ও হ্যাচারি প্রযুক্তি :** ইলিশ মূলত প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত হলেও বর্তমানে কৃত্রিম প্রজনন ও হ্যাচারিতে ইলিশ পোনা উৎপাদনের গবেষণা চলছে। হরমোন প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রজননের মাধ্যমে ইলিশ চাষের প সুগম করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করছে। সফল হলে কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত ইলিশ প্রাকৃতিক মজুদের ওপর চাপ কমাতে সহায়ক হবে।

জেনেটিক উন্নয়ন ও নির্বাচনী প্রজনন : ডিএনএ বারকোডিং ও আণবিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইলিশের ভিন্ন ভিন্ন জনসংখ্যা শনাক্ত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রজননগোষ্ঠী সংরক্ষণ করা সম্ভব। দীর্ঘমেয়াদে নির্বাচনী প্রজনন কর্মসূচি ইলিশের বৃদ্ধি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা এবং টিকে থাকার হার উন্নত করতে পারে। ভূতথ্য ব্যবস্থা ও রিমোট সেন্সিং উপগ্রহ চিত্র ও GIS প্রযুক্তির মাধ্যমে ইলিশের আবাসস্থল, অভিবাসন পথ ও মাছ ধরার হটস্পট নির্ধারণ করা হচ্ছে। ফিশিং ভেসেলে ভিএইচএফ রেডিও, জিপিএস, ফিশ ফাইন্ডার প্রভৃতি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। নদীর প্রবাহ, পলি জমা এবং পানির মান পর্যবেক্ষণ করা হয় যা ইলিশের প্রজননের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ডিজিটাল মনিটরিং ও IoT প্রযুক্তি : ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) ডিভাইস দিয়ে নদীর পানির তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, লবণাক্ততা ও ঘোলাটে ভাব পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। গবেষকরা এসব তথ্য ব্যবহার করে ইলিশের অভিবাসনের সময় পূর্বাভাস দিতে পারেন। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এসব তথ্য জেলেদের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। মৎস্য কো-ম্যানেজমেন্ট ও ই-গভর্নেন্স ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মাছ ধরার লাইসেন্স, নিবন্ধন ও নিষিদ্ধ মৌসুমে মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। স্মার্টকার্ড ও ই-মনিটরিং সিস্টেম জেলেদের মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরকারি সহায়তা (যেমন চাল বিতরণ) সময়মতো পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। কোল্ড চেইন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি পোস্ট-হারভেস্ট ক্ষতি কমাতে আধুনিক সংরক্ষণ প্রযুক্তি যেমন: আইস স্লারি, রেফ্রিজারেটেড ট্রান্সপোর্ট ও ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং ব্যবহার হচ্ছে। সৌরশক্তি চালিত কোল্ডস্টোরেজও কিছু এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি প্রযুক্তি : আন্তর্জাতিক মানসম্মত প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টে ফ্রিজিং, ফিলে তৈরি ও প্যাকেজিং করা হচ্ছে। বোনলেস ইলিশ, ক্যানড ইলিশ ও রেডি-টু-কুক ইলিশের মতো পণ্য জনপ্রিয় হচ্ছে। এতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাড়ছে। গবেষণায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ইলিশের প্রজনন, অভিবাসন ও আবাসস্থল ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ জরুরি। স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং, জিপিএস ও জিআইএস ব্যবহার করে ইলিশের গতিপথ নির্ধারণ করা সম্ভব। জেনেটিক গবেষণা, ডিএনএ বারকোডিং ও বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে ইলিশের জৈববৈচিত্র্য রক্ষায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইলিশের আবাসস্থলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, পানির তাপমাত্রা পরিবর্তন ও প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। এসব প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজনমূলক কৌশল যেমন আবাসস্থল সংরক্ষণ, টেকসই নীতি প্রণয়ন, ঝুঁকিপূর্ণ জেলে সম্প্রদায়ের জন্য দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

(লেখক : ড. মাসুদ রানা, সহকারী অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)

স্নাতকের শিক্ষার্থী হামিম এখন সফল খামারি

ছোটবেলা থেকেই পাখি ভালোবাসতেন খাগড়াছড়ির স্নাতকের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ হামিম। মায়ের দেওয়া হাতখরচ বাঁচিয়ে চারটি কোয়েল পাখি কিনেছিলেন। এখন শহরের কদমতলী এলাকায় এক হাজার কোয়েল, ১১ জাতের মুরগি, ৮ জাতের কবুতর, দুই জাতের ঘুঘু আর ১৬টি ছাগল নিয়ে বড় খামার গড়েছেন। পরিচিতি পেয়েছেন সফল খামারি হিসেবে। খামারে বিশেষ জাতের মোরগ হাতে খামারি মোহাম্মদ হামিম। খাগড়াছড়ির কদমতলী এলাকায় মায়ের দেওয়া হাতখরচ বাঁচিয়ে চারটি কোয়েল পাখি কিনেছিলেন তিন বছরের বেশি সময় আগে। মোহাম্মদ হামিমের শুরুটা এভাবেই। তখনো জানতেন না হাতখরচের টাকায় শুরু করা উদ্যোগটা এত বড় হয়ে উঠবে। খাগড়াছড়ির কদমতলী এলাকায় এক হাজার কোয়েল পাখি, ১১ জাতের মুরগি, ৮ জাতের কবুতর, দুই জাতের ঘুঘু আর ১৬টি ছাগল নিয়ে বড় খামার গড়েছেন। পরিচিতি পেয়েছেন সফল খামারি হিসেবে। হামিম খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তার বাবা আব্দুল বাতেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হলেও ছোটবেলা থেকেই হামিম স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের কিছু করার ইচ্ছা থেকেই তিনি খামার গড়ার পথে হাঁটেন। খামার থেকে এই শিক্ষার্থী বর্তমানে প্রতি মাসে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা আয় করেন। সম্প্রতি হামিমের বাড়িতে গেলে দেখা যায়, উঠানেই ছাগলের খামার। একটু সামনে বড় একটি কোয়েল শেড। চারপাশে কবুতরের ঘর। সেমিপাকা বাড়ির ভেতরের তিনটি কক্ষ ও বারান্দায় রয়েছে নানা জাতের মুরগি, ঘুঘু, কবুতর আর পার্শিয়ান বিড়াল। পুরো বাড়িটা যেন ছোট একটা চিড়িয়াখানা। হামিম বলেন, ছোটবেলা থেকেই পশুপাখির প্রতি তার আলাদা ভালোবাসা ছিল। তার বাবাও আগে কবুতর পালন করতেন। বাবাকে দেখেই পাখির প্রতি আগ্রহ জন্মায়। সুযোগ পেলে নিজেও কিছু করবেন এই ভাবনা থেকেই খামারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ২০২২ সালে তাঁর শখ হয় কোয়েল পাখি পোষার। তখন নিজের হাতে তেমন টাকা ছিল না। মা যে হাতখরচ দিতেন, তার সবটুকু খরচ না করে অল্প অল্প করে জমাতে থাকেন। ১৮০ টাকা দিয়ে চারটি কোয়েল পাখি কিনেছিলেন। কোয়েল দিয়ে শুরু হলেও হামিম এখন নানা জাতের পাখি ও মুরগি পালন করছেন। তাঁর খামারে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার কালো আয়াম সেমানি (Ayam Cemani), বিশ্বের বড় আকারের ব্রাহমা,

চীনের কোচিন, মালয়েশিয়ার ছোট সেরেমা (Serema), ভারতের কালো মাংসের কাদাকনাথসহ নানা জাতের মুরগি। পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলের 'হেজো' ও 'লাইজ্জা' মুরগিও রয়েছে। হামিম বলেন, তখন বুঝতেই পারেননি এই চারটি পাখিই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কোয়েলগু-লা ডিম দেওয়া শুরু করে। আশপাশের মানুষজন আগ্রহ নিয়ে ডিম কিনতে থাকেন। ডিম বিক্রি করে যে টাকা আসত, সেটাই আবার জমাতেন হামিম। নিজের জমানো টাকার সঙ্গে সেটুকু যোগ করে একসময় ১০০টি কোয়েল কিনে ছোট আকারে খামার গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে খামার বড় হতে থাকে। সব মিলিয়ে খামারে বিনিয়োগ আছে চার লাখ টাকার মতো। বর্তমানে তার খামারে প্রায় এক হাজার কোয়েল পাখি রয়েছে। নিয়মিত ডিম ও মাংস বিক্রি হচ্ছে স্থানীয় বাজারে। এক বছর ধরে হামিম ছাগল পালনেও যুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে তার খামারে ১৬টি ছাগল রয়েছে। তিনি মনে করেন, একাধিক খাত থাকলে আয় বাড়ে এবং ঝুঁকিও কমে। তবে হামিম বলেন, পরিকল্পনা আর পরিশ্রম থাকলে দুটোই একসঙ্গে করা যায়। এ কাজে মা-বাবা সব সময় পাশে ছিলেন। তাদের সহযোগিতা না পেলে এত দূর আসা সম্ভব হতো না বলেও জানান তিনি। হামিম বলেন, তিনি শুধু চাকরির পেছনে দৌড়াতে চান না। পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের একটা পরিচয় তৈরি করতে চান। ভবিষ্যতে খামার আরও বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। খাগড়াছড়ি জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. জুলফিকার আলী বলেন, 'হামিম তরুণদের জন্য একজন আদর্শ। তিনি তার পশুপাখি নিয়ে বিভিন্ন মেলায় অংশ নিচ্ছেন। গত বছরের নভেম্বরে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহে (২০২৫) তিনি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। তার সংগ্রহে অনেক পাখি আছে। প্রয়োজন হলে আমরা তাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব।' **(সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো ২০ জানুয়ারি ২০২৬)**

মাছ চাষে বাজিমাত বাবুল মিয়ার

বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ এখন মৎস্য খাত। সরকারের নানামুখী উদ্যোগে দেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও এর পেছনের কারিগর মূলত বাবুল মিয়ার মতো সাহসী উদ্যোক্তারা। কুমিল্লার কটক বাজারের এক সাধারণ যুবক থেকে সফল খামারি হয়ে ওঠার গল্পটি রূপকথার মতো মনে হলেও এর পেছনে রয়েছে এক দশকের হাড়ভাঙা খাটুনি আর ধৈর্য্য। চাকরির পেছনে সোনার হরিণের মতো না ছুটে তিনি নিজের মাটিতেই ফলিয়েছেন রূপালি ফসল। আজ তার খামারের নাম শুনলেই স্থানীয়দের চোখে ফুটে ওঠে এক সফল মানুষের প্রতিকৃতি।

উদ্যোগের নেপথ্যে: কর্মসংস্থান যখন নিজেই তৈরি করলেন ২০১৪ সালের কথা। চারদিকে যখন চাকরির জন্য হাহাকার, তখন বাবুল মিয়া ভাবলেন ভিন্ন কিছু। অন্যের অধীনে কাজ না করে নিজেই একটি কর্মসংস্থান তৈরির জেদ তার মাথায় চেপে বসে। শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নয় বরং একটি টেকসই বিকল্প আয়ের পথ খুজতেই তিনি মৎস্য চাষের সিদ্ধান্ত নেন। কটক বাজারের পৈতৃক জমিতে থাকা পুকুরগুলো সংস্কার করে শুরু করেন 'বাবুল মৎস্য খামার'। শুরুর দিকে পথটা মসৃণ ছিল না, ছিল পুজি আর অভিজ্ঞতার অভাব। কিন্তু দমে যাননি তিনি। খামারের পরিধি ও আধুনিক চাষ পদ্ধতি বর্তমানে বাবুল মিয়ার খামারটি ১১০ শতাংশ জমি জুড়ে বিস্তৃত, যেখানে রয়েছে ছোট-বড় তিনটি পুকুর। তিনি কেবল সনাতন পদ্ধতিতে মাছ ছাড়েন না বরং আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাঁর দুটি পুকুরে চলছে কার্প জাতীয় মাছের (রুই, কাতলা, মৃগেল) মিশ্র চাষ। এই পদ্ধতিতে একই পানিতে বিভিন্ন স্তরের মাছ বড় হয়, ফলে খাদ্যের অপচয় কম হয়। অন্যদিকে, একটি পুকুর তিনি উৎসর্গ করেছেন পাঙ্গাস মাছের একক চাষের জন্য। অল্প সময়ে অধিক লাভ নিশ্চিত করতে পাঙ্গাস চাষে তিনি বিপ্লব ঘটিয়েছেন। মানসম্মত পোনার জন্য তিনি কোনো দালালের খপ্পরে না পড়ে সরাসরি স্থানীয় সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার থেকে পোনা সংগ্রহ করেন। বাবুল মিয়া বিশ্বাস করেন, "পোনা যদি মানসম্মত না হয় তবে পুরো খাটুনিই বৃথা।" শ্রমের মূল্য ও কারিগরি ব্যবস্থাপনা সফলতার জন্য দরকার নিবিড় তদারকি। বাবুল মিয়ার খামারে বর্তমানে একজন স্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন, যিনি দিনরাত পুকুরের যত্ন নেন। এ ছাড়া মাছ ধরা বা পোনা ছাড়ার মতো বিশেষ সময়ে আরও ৩ জন অনিয়মিত শ্রমিক কাজ করেন। এতে করে পরোক্ষভাবে বেশ কয়েকটি পরিবারের অন্নসংস্থান হচ্ছে তার এই খামারের মাধ্যমে। মাছের খাবারের ক্ষেত্রেও তিনি আপসহীন। প্রতিদিন নিয়ম করে মেগা কোম্পানির ফিড ও নারিশ ব্র্যান্ডের উন্নত মানের সুষম খাবার দেওয়া হয়। বাবুল মিয়ার মতে,"মাছকে সময়মতো পুষ্টিকর খাবার দিলে যেমন দ্রুত বড় হয়, তেমনি তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে।" সংকট মোকাবিলা ও সরকারি সহায়তায় মাছ চাষে সবচেয়ে বড় ভয় হলো মড়ক। বাবুল মিয়ার খামারেও বিভিন্ন সময় ভাইরাস এবং 'আরগুলাস' বা মাছের উকুনের আক্রমণ দেখা দিয়েছে। আগেকার দিনে অনেক খামারি এমন পরিস্থিতিতে দিশেহারা হয়ে লোকসান গুনতেন। কিন্তু বাবুল মিয়া শুরু থেকেই স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। কর্মকর্তাদের পরামর্শে সঠিক ঔষধ এবং আধুনিক ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করে তিনি মড়ক থেকে মাছগুলোকে রক্ষা করেছেন। মৎস্য দপ্তরের সাথে এই নিবিড় সমন্বয়ই তাকে একজন দক্ষ খামারি হিসেবে গড়ে তুলেছে। ঈর্ষণীয় উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বছরে বর্তমানে বাবুল মিয়ার খামার থেকে প্রায় ৮ হাজার কেজি বা ৮ টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। এই বিশাল পরিমাণ মাছ স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করা হয়। বাজারজাতকরণে তার কোনো সমস্যা হয় না কারণ খামারের তাজা মাছের জন্য পাইকাররা পুকুর পাড়েই ভিড় করেন। বছরের শেষে খরচের তুলনায় মুনাফার অংকটা বেশ ভালোই থাকে, যা তাকে ভবিষ্যতে আরও বড় বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে। তরুণ সমাজের জন্য বাবুল মিয়ার বার্তা বাবুল মিয়া এখন আর কেবল একজন খামারি নন, তিনি একজন পথ প্রদর্শক। শিক্ষিত তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, "পড়াশোনা শেষ করে বেকার বসে থাকাটা অভিশাপের মতো। চাকরির পেছনে না ছুটে শিক্ষিত তরুণরা যদি আধুনিক জ্ঞান নিয়ে মাছ চাষে নামেন, তবে হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মৎস্য চাষ একটি সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা। কেউ যদি আমার কাছে পরামর্শ নিতে চায়, তবে আমি নিঃস্বার্থভাবে তাঁদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।" ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সাফল্যের এই ধারা বজায় রেখে বাবুল মিয়া ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে খামার করার স্বপ্ন দেখছেন। তিনি আধুনিক 'বায়োফ্লক' বা 'আরএএস' পদ্ধতির মতো প্রযুক্তি যোগ করে বাণিজ্যিক মাছ চাষকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান। তাঁর এই উদ্যোগ কেবল তার নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায়নি, বরং কুমিল্লার মৎস্য খাতে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। সবশেষে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস কুমিল্লার পক্ষ থেকে সংশিষ্ট বিষয়ের উপর মুদ্রণ সামগ্রী বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। **(প্রতিবেদক: খালেক হাসান, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, কুমিল্লা)**

"বেশি বেশি মাছ চাষ করি
পুষ্টি সমৃদ্ধ দেশ গড়ি"

টিউশনির টাকায় শুরু হওয়া আসাদুজ্জামানের 'আমার খামার' এখন যেন সবার

শহরের যান্ত্রিকতা, যানজট ও ইটপাথরের দেয়ালের মধ্যে যখন দম বন্ধ হয়ে আসে, তখন আমরা স্বপ্ন দেখি একটুকরা সবুজের। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে কজনইবা সাহস করে মাটির টানে ফিরে যেতে পারেন? আসাদুজ্জামান পেরেছেন। শরীয়তপুরের গোসাইরহাটের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে তিনি। মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সেলিনা আক্তার, বাবা প্রয়াত দেওয়ান আলাউদ্দিন। কিন্তু আসাদুজ্জামানের পরিচয় আজ শুধুই এক জননীর সন্তান হিসেবে নয়; বরং একজন সফল স্বপ্নদ্রষ্টা ও উদ্যোক্তা হিসেবে। শূন্য থেকে শুরু গল্পটি শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ব্যবসায় প্রশাসনে পড়ার সময় থেকেই আসাদুজ্জামানের মাথায় ঘুরত 'নিজে কিছু করতে হবে'। পকেটে টাকা নেই, কিন্তু বুকে ছিল পাহাড়সম জেদ। সেই জেদ থেকেই শুরু হলো হাড়ভাঙা খাটুনি। একদিকে পড়াশোনা, অন্যদিকে টিউশনি ও ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানে চাকরি। অর্থ জমিয়ে দুই লাখ টাকা যখন হাতে এল, তখনই তিনি নামলেন জীবনের আসল পরীক্ষায়। অনেকে যখন এসি রুমে বসে ভবিষ্যতের ছক কষেন, আসাদুজ্জামান তখন রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঘুরতেন কারওয়ান বাজারে। কোন পণ্য কোথা থেকে আসছে, পাইকারি দর কত; এসব তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে। মাঠ থেকে ঘাটাইলের পথে ২০১৮ সালে নিজের গ্রামে মাত্র এক হাজার ব্রয়লার মুরগি আর ছোট একটি পুকুরে মাছ চাষ দিয়ে আসাদুজ্জামানের যাত্রা শুরু। কিন্তু আসাদুজ্জামানের লক্ষ্য ছিল আরও বড়। তিনি চাইলেন এমন জায়গায় খামার করতে, যেখান থেকে ঢাকা খুব কাছে। বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে বেছে নিলেন টাঙ্গাইলের ঘাটাইল। ২০২২ সালে ১৩ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু হলো 'আমার খামার'। বন্ধু সাব্বির হাসানকে সঙ্গে নিয়ে ১ হাজার ২০০ লেয়ার মুরগি দিয়ে যে পথচলা শুরু হয়েছিল, আজ সেখানে ২৫ হাজার মুরগি। প্রতিদিন ২৫ হাজার ডিম তার নিজস্ব পরিবহনে পৌঁছে যায় ঢাকার বড় বড় আড়ৎ ও দোকানে। তার কর্মযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের পর মাঠ। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন শোভা পাচ্ছে ১ হাজার ৮০০ পেঁপেগাছ আর সাড়ে চার হাজার সাগর কলার বাগান। চুয়াডাঙ্গা থেকে যশোর; দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে তার মৌসুমি ফসলের প্রকল্প। বর্তমানে ৩২ জন কর্মী দিনরাত খাটছেন এই স্বপ্নকে সচল রাখতে। কৃষকের বন্ধু 'আমার খামার' আসাদুজ্জামান বিশ্বাস করেন, একা বড় হওয়ার নাম সাফল্য নয়। তাই তিনি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্মার্ট ফার্মিং চালু করেছেন। ডিজিটাল মনিটরিংয়ের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকেরা এখন ফসলের রোগবালাই বা বাজারদর সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সমাধান পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ২০২৭ সালের মধ্যে পাঁচ লাখ কৃষককে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন তিনি। সম্প্রতি চালু করেছেন কৃষকের সন্তানের জন্য শিক্ষাবৃত্তি। 'আমার খামার গ্রামীণ অ্যাগ্রি রিসোর্ট' চালুর পরিকল্পনা রয়েছে আসাদুজ্জামানের আগামী দিনের স্বপ্ন: অ্যাগ্রি রিসোর্ট ঘাটাইলের সেই সবুজ খামারে দাঁড়িয়ে আসাদুজ্জামান শোনালেন তার বড় স্বপ্নের কথা। ২০২৬ সাল নাগাদ তিনি চালু করতে যাচ্ছেন 'আমার খামার গ্রামীণ অ্যাগ্রি রিসোর্ট'। এটি কেবল বিলাসী কোনো অবকাশকেন্দ্র হবে না, এটি হবে এমন এক জায়গা, যেখানে শহরের মানুষ এসে নিজ হাতে কৃষিকাজ দেখবে, মাটির ঘ্রাণ নেবে এবং প্রকৃতির সঙ্গে গড়ে তুলবে এক আত্মিক সম্পর্ক। আসাদুজ্জামান বলেন, 'প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখলেই আমাদের ভবিষ্যৎ টেকসই হবে। কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে আমার খামার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৭ সালের মধ্যে পাঁচ লাখ কৃষককে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন'। **(সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)**।

২ বিলিয়ন ডলার চিংড়ি রপ্তানিতে মাস্টার প্ল্যান

সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ৫০ (২০২৫-২০৭৫) বছরের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে সরকার। তিনটি পর্যায়ে নতুন রপ্তানি জোনে সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রায় ৬২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। এর বিপরীতে আয়ে হবে প্রতি বছর প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৪ হাজার কোটি টাকা। কক্সবাজারের চকরিয়ায় অবস্থিত সরকারি চিংড়ি এস্টেট ও সংলগ্ন এলাকা একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে, যা তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে চিংড়ি এস্টেটের (সরকারি) ৭ হাজার একর মূল জমি এবং সংলগ্ন ২১ হাজার একর এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য

উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব এলাকায় আধুনিক সামুদ্রিক মৎস্য চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হবে। এ জন্য জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো ও সহায়ক অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাঁধ, যাতায়াতের জন্য সড়ক, ফিশ ল্যান্ডিং স্টেশন, বরফ কল ও ফিশ ফিড কারখানা, আবাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিপণন কেন্দ্র ও ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পর্যটন বিকাশের জন্য তৈরি হবে একটি ইকোপার্ক। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করা হবে বাঁধ সংলগ্ন এলাকায়। পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি ব্যাপক ভূমি ব্যবহার এবং জোনিং কাঠামো। সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক মনিষ কুমার মণ্ডল বলেন, 'প্রায় ২৮ হাজার একর জমির এ বিশাল

কর্মযজ্ঞ। নতুন রপ্তানি জোনে সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রায় ৬১ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। এখানে সরকারি ও বেসরকারি পার্টনারশিপ, অপরদিকে বিদেশিদের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগও হতে পারে। এক্ষেত্রে মডেল ৮০ থেকে ২০ অনুযায়ী সরকারিভাবে ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ৪৯ হাজার ৩৮৬ কোটি টাকা এবং প্রাইভেট বা বেসরকারি ২০ শতাংশ বিনিয়োগ অর্থাৎ ১২ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। মডেল ৭০ থেকে ৩০ এবং ৬০ থেকে ৪০ মডেল তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি ও প্রথম ধাপ অনুযায়ী উৎপাদন ৭১৫ মেট্রিক টন, দ্বিতীয় ধাপে উৎপাদন ৪ হাজার ২২৪ মেট্রিক টন এবং তৃতীয় ধাপে উৎপাদন ১১ হাজার ২৫৯ মেট্রিক টন। যার ধারাবাহিকতায় প্রথম ধাপের ৫ বছরে আয় ৭২ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১২৭ মিলিয়ন ডলার এবং ৩৩৮ মিলিয়ন ডলার আয়ের সম্ভাব্য হিসেবে করা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী, মৎস্য চাষ, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ, ইকো-ট্যুরিজম এবং পরিষেবা খাতে এখানে প্রায় ৫০ হাজার এরও বেশি সরাসরি কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যা এলাকার দারিদ্র্যতা হ্রাসে সহায়তা করবে। এখানে দেড় লাখ মানুষের বসবাসের সুযোগ তৈরি করা হবে। যাতায়াত ব্যাবস্থা সহজীকরণের জন্য চৌফলদীতে মাতামুহুরী নদীর ওপর একটি নতুন সেতু প্রস্তাব করা হয়েছে, যার সঙ্গে একটি পেরিফেরাল ডাইক-রোড থাকবে যা প্রাথমিকভাবে ২৬ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ৫০ বছরের মধ্যে ১১০ কিলোমিটারে উন্নীত হবে। মনিষ কুমার মণ্ডল আরো বলেন,

এই পরিকল্পনাটি তিনটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। প্রথম ধাপ (২০২৬-২০৩০) পুকুর পুনর্বাসন, স্লুইসগেট মেরামত এবং পাইলট আধা-নিবিড় চাষের মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলোকে স্থিতিশীল করবে। প্রথম ধাপে মোট ২,৩৪২ দশমিক ৫ হেক্টর এলাকায় উন্নত এক্সটেনসিফ এবং সেমি ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে প্রকল্পের ভিত্তি গড়ে তোলা হবে। এ পর্যায়ে বছরে প্রায় ৭ হাজার ১৫২ মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ধাপে বছরে প্রায় ১৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হবে এবং চিংড়ি এস্টেটের মৌলিক অবকাঠামো তৈরি করা হবে। এ পাঁচ বছরে মোট প্রায় ৬৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বছরে অপারেশনাল ব্যয় প্রায় ১০ দশমিক ২৩ মিলিয়ন ডলার এবং অবকাঠামোগত বিনিয়োগ প্রায় ৫১০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। এই ধাপ মূলত ভবিষ্যত

সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও অবকাঠামোগত ভিত্তি তৈরি করবে। দ্বিতীয় ধাপ (২০৩১-২০৪৫) আধা-নিবিড় জলজ চাষ সম্প্রসারণ করবে, প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, আবাসিক এবং সামাজিক সুবিধা এবং ইকো-ট্যুরিজম অঞ্চল তৈরি করবে। সম্প্রসারণের ধাপ, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সেমি ইনটেনসিভ এবং ইনটেনসিভ চাষ পদ্ধতির দিকে উন্নীত করা হবে। প্রায় ৮ হাজার ৯০০ হেক্টর এলাকায় বছরে প্রায় ৪২ হাজার ২৪২ মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে বছরে প্রায় ৬১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা ১৫ বছরে মোট আয় প্রায় ৯ দশমিক ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বছরে অপারেশনাল ব্যয় প্রায় ৪১ মিলিয়ন ডলার এবং অবকাঠামো বিনিয়োগ প্রায় ৬৯৫ মিলিয়ন ডলার ধরা হয়েছে। এই ধাপ চিংড়ি খাতের অর্থনৈতিক উৎপাদন ও ভ্যালু চেইনকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে। তৃতীয় ধাপ (২০৪৬-২০৭৫) বৈচিত্র্যময় জলজ চাষ, নবায়নযোগ্য শক্তিচালিত খামার, পূর্ণ-স্কেল ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি এবং ১ লাখ ৫০ হাজার বাসিন্দাকে সহায়তাকারী আধুনিক বসতিসহ একটি চিংড়ি শহরকে একীভূত করবে। হলো প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ধাপ, যেখানে ইনটেনসিভ এবং সুপার ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হবে। এই পর্যায়ে বছরে প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার ৫৯০ মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি, অটোমেশন এবং উচ্চ ঘনত্বের চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা

হবে। এ বছরে প্রায় ১ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৩০ বছরের সময়কালে মোট আয় প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। এই ধাপ প্রকল্পটির সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রদর্শন করে। মাস্টার প্ল্যানে আরও বলা হয়েছে, ২০৭৫ সালের মধ্যে, চকরিয়া চিংড়ি শহর বাংলাদেশের নীল অর্থনীতির একটি প্রধান প্রতীক হিসেবে দাঁড়াবে: একটি জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক জলজ চাষ কেন্দ্র। এটি খাদ্য নিরাপত্তা, বৈদেশিক মুদ্রা আয়, স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো, পরিবেশগত পুনরুদ্ধার এবং বিস্তৃত-ভিত্তিক জীবিকা প্রদান করবে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় টেকসই উপকূলীয় উন্নয়নের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করবে। তিনটি ধাপে চিংড়ি এস্টেটের মোট আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা প্রথম ধাপে এ বছরে প্রায় ২১০ মিলিয়ন ডলার থেকে তৃতীয় ধাপে বছরে প্রায় ২৩ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। আয়ের প্রধান উৎস হবে চিংড়ি বিক্রি, ভ্যালু-অ্যাডেড পণ্য এবং বাই-প্রোডাক্ট ব্যবহার। এই বহুমুখী আয়ের কাঠামো প্রকল্পটির আর্থিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। মৎস্য অধিদপ্তরে এক কর্মকর্তা আরও বলেন, 'বৈচিত্র্যময় জীবিকা, শক্তিশালী সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থাকে একীভূত করে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এলাকাটিকে নীল অর্থনীতির প্রচারের জাতীয় প্রদর্শনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। বর্তমানে এই ৫৯ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ, স্লুইসগেট নির্মাণ ও সংস্কার, অফিস ও গার্ডরুম নির্মাণ, এ দর্শনায় খামার নির্মাণ সব বেড়ি বাঁধে বনায়ন কার্যক্রম চলছে। **(সূত্রঃ তরিকুল ইসলাম সুমন, সাংবাদিক, দৈনিক জাতীয় অর্থনীতি)**

উন্নত জাতের ফ্রিজিয়ান গাভির কালো-সাদা ছোপে বদলে গেছে বাইশপাড়া গ্রামের প্রায় ২৮০ পরিবার

হলহলিয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে জেগে ওঠা একটুকরো চর। বর্ষায় যেখানে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই, শীতে সেখানে ধূসর বালুর বিস্তার। সেই চরের মাঝখানেই কুড়িগ্রামের রৌমারীর বন্দবেড় ইউনিয়নের বাইশপাড়া গ্রাম। এই প্রত্যন্ত গ্রামে তিন শতাধিক পরিবারের বাস। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের 'নীরব সহাবস্থান'। তবে কাছে গেলেই চোখে পড়ে অন্য এক ছবি। একসময় নদীতে মাছ ধরা, কৃষিকাজ ছিল এখানকার মানুষের প্রধান পেশা। কিন্তু বন্যা, খরা আর নদীভাঙনের কাছে বারবার হার মানতে হয়েছে তাদের। এসব মানুষ তখন দিনমজুরি, অন্যের জমিতে কাজ কিংবা শহরমুখী হওয়ার পরিকল্পনা করে। আজ সেই প্রত্যন্ত গ্রামের চরেই শোনা যায় ভাগ্য বদলের গল্প। উন্নত জাতের ফ্রিজিয়ান গাভির কালো-সাদা ছোপে বদলে গেছে বাইশপাড়া গ্রামের প্রায় ২৮০ পরিবারের জীবনগাঁথা। একসময় যে চর ছিল অনিশ্চয়তার প্রতীক, এখন তা হয়ে উঠেছে সম্ভাবনার ঠিকানা। ভোর-বিকেলে বাইশপাড়া ভোরের আলো ফোটা ও বিকেলের আগেই বাইশপাড়ায় শুরু হয় কর্মব্যস্ততা। কেউ দুধ দোহন করছেন, কেউ দুধ মাপছেন। কেউ আবার খাতায় লিখছেন হিসাব। দোহন করা দুধ বড় বড় হাঁড়ি, বালতিতে করে হেঁটে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যান রৌমারী সদর হাট-বাজারে। কেউ কেউ বিক্রি করেন স্থানীয় বাজারে। খামারিরা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার পর বাকি দুধ দিচ্ছেন দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্রে (চিলিং প্লান্ট)। পতিত চর থেকে উৎপাদনের মাঠ চরের খোলা মাঠের প্রাকৃতিক ঘাস আর অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে উন্নত জাতের গাভি পালনে ঝুঁকছেন চরবাসী। কম খরচে লালন-পালন, স্থানীয় চাহিদা সব মিলিয়ে গাভি পালন হয়ে উঠেছে চরবাসীর জন্য তুলনামূলক নিরাপদ পেশা। একটি গরু দিয়ে শুরু করা অনেকেই আজ গড়ে তুলেছেন ছোটখাটো খামার। বাইশপাড়া গ্রামের খামারি ফিরোজা বলেন, ২০০৭ সালে ১২ হাজার টাকায় একটি দেশি গাভি কিনে পালন শুরু করছিলাম। ২০১৪ সালে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪ হাজার টাকা দেয় এক এনজিও। বাড়িতে থাকা দেশি গরুটি বিক্রি, এনজিওর সে টাকা এবং বিভিন্ন জনের কাছ থেকে নেওয়া টাকা এক করে উন্নত জাতের ফ্রিজিয়ান গাভি কিনেছি ৬১ হাজার টাকায়। ওই গাভির একটি বাছুর ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি করি। এভাবেই এগিয়ে এখন আমার খামারে রয়েছে ১৭টি গাভি। প্রতিদিন দুধ পাচ্ছি ৭০-৮০ লিটার। আমাকে দেখে গ্রামের অনেকে বাড়িতে গাভি পালন শুরু করেছেন। গরু পালনের জন্য ২০২১ সালে পড়ালেখা বাদ দিয়ে নিজ বাড়িতে ছুটে আসেন খামারি ফিরোজার সন্তান ফিরোজ মিয়া। তিনি বলেন, প্রতি বছর আয় হয় ৮ থেকে ১০ লাখ টাকা। কিছুদিন আগে দুটি গরু বিক্রি করেছি চার লাখ টাকায়। প্রতিবছর যে বাচ্চাগুলো হয় সেগুলো বিক্রি করে জমি রাখি ও সংসারের কাজ করি। দৈনিক ৭০ থেকে ৮০ লিটার দুধ পাই। সেই বিক্রির টাকায় আমার পরিবার ও গরুর সব খরচ চলে যায়। ঝুঁকি থেকে সম্ভাবনার পথে শুরুর দিকে সবকিছু এত সহজ ছিল না। চরের কাঁচা সড়ক, চিকিৎসার অভাব, খাবারের অনিশ্চয়তা মিলিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, এই উন্নত জাতের গাভি কি চরের প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারবে? তবে সাহস হারাননি তারা। নিজেদের জমানো টাকা, কখনও ঋণ নিয়ে কিনেছেন উন্নত জাতের গাভি। স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিসের পরামর্শে গড়েছেন গোয়ালঘর, শিখেছেন খাবারের সুষম মিশ্রণ আর রোগ-বালাইয়ের প্রাথমিক চিকিৎসা। যেখানে দেশি গাভি দিনে দুই-তিন লিটারের বেশি দুধ দিত না, সেখানে ফ্রিজিয়ান গাভি দিচ্ছে ৮ থেকে ১২ লিটার পর্যন্ত দুধ। কারও কারও খামারে দুধের পরিমাণ আরও বেশি। বদলে যাওয়া সংসার-সমাজ উন্নত

জাতের গাভি শুধু আয় বাড়ায়নি, বদলে দিয়েছে গ্রামের সামাজিক চিত্রও। এক সময় যেখানে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী, সেখানে এখন অনেকের পাকা ঘরে টিনের ছাউনি; সন্তানের পড়াশোনার খরচের নিশ্চয়তা। কেউ কিনেছেন মোটরসাইকেল, কেউ আবার স্বপ্ন দেখছেন পাকা ঘরের। নারীরাও এই পরিবর্তনের বড় অংশীদার। অনেক পরিবারে গাভির দেখভাল, দুধ দোহন আর দই-ঘি তৈরির দায়িত্ব নারীর হাতে। ফলে আয় বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে তাদের আত্মবিশ্বাস আর পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ। গ্রামের নারীরা এখন শুধু গৃহকর্মে সীমাবদ্ধ নন; তারা খামারের ব্যবস্থাপকও। বাইশপাড়া গ্রামের খামারি লাভলী খাতুন বলেন, 'সাত বছর আগে প্রথমে আমরা দেশি গরু পালতাম। পরে ৫০ হাজার টাকায় একটি ফ্রিজিয়ান গাভি কিনি। তখন দুধ হয়েছিল তিন কেজি করে। ফ্রিজিয়ান গাভি বাচ্চা দেয় বছর বছর। আবার দুধ বিক্রি করে টাকা হয়। এভাবে চলতে চলতে এখন গরু হয়েছে ৯টি। এর মধ্যে গাভি চারটি ও বাছুর পাঁচটি। প্রতিদিন গরুর দুধ পাই ৫০ কেজি।' খামারি রাশেদা খাতুন বলেন, 'প্রথমে আমার একটি দেশি গরু আছাল। হেইডা আমি বিক্রি কইরা দুই লাখ টাকা দিয়া একটা গাই কিনছিলাম। কিছু টাকা আমার আছাল, আর কিছু হাওলাত কইরা কিনছি। হেই গাই পানাইছি, দুধ বিক্রি করছি, সংসার চালাচ্ছি। এখন সাতটি গরু। প্রতিদিন ২০ থেকে ২২ কেজি দুধ পাচ্ছি।' উদ্যোগের গল্প খামারিরা বলছেন, সফলতার পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি শেখার আগ্রহ। নিয়মিত টিকা, পরিচ্ছন্ন গোয়া-লঘর, সঠিক খাবার ব্যবস্থাপনা এখন তাদের নিত্যদিনের চর্চা। কেউ কেউ অন্যের দেখে শিখছেন; কেউ আবার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ নিচ্ছেন। গ্রামে ছয়টি গরু পালন করেন খামারি গোলাম হোসেন। তিনি বলেন, আগে আমরা নদীর দিকে তাকিয়ে ভয় পেতাম। এখন গাভির দিকে তাকিয়ে সাহস পাই। একটা ফ্রিজিয়ান গাভি মানে একটা পরিবারের মাসের খরচের নিশ্চয়তা। এখনও রয়েছে চ্যালেঞ্জ সব সাফল্যের মাঝেও চ্যালেঞ্জ একেবারে নেই, তা নয়। নদী ভাঙনের শঙ্কা এখনও বাইশপাড়া গ্রামের মানুষের পিছু ছাড়ে না। বর্ষায় যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। খাবারের দাম বাড়লে খরচের চাপও বাড়ে। গাভি অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসা পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। তবু বাইশপাড়া গ্রামের এসব মানুষ হাল ছাড়তে শেখেনি। কারণ তারা জানে, এই গাভির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তাদের ভবিষ্যৎ। সম্ভাবনার চর ব্রহ্মপুত্র ও হলহলিয়া নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাইশপাড়া গ্রাম এখন এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মাঝেও কীভাবে পরিকল্পনা, পরিশ্রম আর সাহস দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়, তার প্রমাণ এই বাইশপাড়ার চর। ফ্রিজিয়ান জাতের গাভির কালো-সাদা ছোপে এখন শুধু গোয়ালঘর নয়, রঙিন হয়ে উঠেছে গ্রামের জীবন। নদীর স্রোত যেমন থেমে থাকে না, তেমনি থেমে নেই বাইশপাড়া গ্রামের মানুষের স্বপ্ন। রৌমারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান পাইকাড় বলেন, বাইশপাড়া গ্রামে এলডিডিপির আওতায় আমাদের একটি পিজি গ্রুপ রয়েছে। সরকারিভাবে তাদের অনেক সহায়তা দিয়েছি। এর মধ্যে ঘাস কাটার জন্য যন্ত্র, দুধ উৎপাদন, ফিড, কৃমিনাশক ওষুধ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে থাকি। তিনি বলেন, আমার মনে হয়, বাইশপাড়া সারাদেশের মধ্যে উজ্জ্বল একটি এলাকা। এখানে তিন শতাধিক ডেইরি খামার রয়েছে। প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন হাজার লিটার দুধ উৎপাদন হচ্ছে। এ দুধ রৌমারীবাসীর চাহিদা পূরণ করে জামালপুর, শেরপুর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। এলডিডিপির আওতায় একটি স্মল মিল্ক চিলিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। **(সূত্র: দৈনিক সমকাল, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬)**

দেশ গঠনে অবদান রাখলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল্যায়ন করবে সরকার : খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী

খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশ গঠনে প্রদত্ত অবদান সরকার যথাযথ মর্যাদা ও প্রাপ্য স্বীকৃতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করবে। পবিত্র ঈদুল ফিতর শেষে ২৪ মার্চ মঙ্গলবার দুপুরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যুগোপযোগী উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এ ধরনের পরিবর্তন আসলে দেশ উপকৃত হবে। মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, ঈদের আনন্দ বছরের বাকি সময় জুড়েও মানুষের জীবনে বিরাজ করবে। তিনি বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া ঈদ উদযাপনের ঐতিহ্য সেমাই, শিন্নি ও পোলাওসহ নানা আয়োজন আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের জন্য উন্নত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। তিনি দেশের উন্নয়ন ও মানবিক দায়িত্ব পালনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং সকলের কাছে দোয়া এবং দেশবাসীর সুখ-শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. ইমাম উদ্দীন কবীরসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান (সিনিয়র তথ্য অফিসার) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)**

মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নিম্ন আয়ের মানুষের স্বস্তি

বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধাবস্থা, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধি, সিন্ডিকেট বা অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি, দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা এবং পরিবহন খরচের কারণে বাংলাদেশে বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিশেষকরে প্রাণিজ প্রোটিন-যেমন মাংস, ডিম, দুধ ও মাছের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, যা জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। প্রায়শ দেখা যায়, রমজান বা ঈদুল ফিতরের আগে নিত্য পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট অবৈধ উপায়ে দাম বাড়ানোর চেষ্টা করে। ফলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাদের আয়ের বড় অংশ খাদ্যপণ্যের পেছনে ব্যয় হওয়ায় তারা সঞ্চয় করতে পারে না, এমনকি পুষ্টিকর খাবার কেনাও কমিয়ে দেয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও রমজান মাসে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট অবৈধ উপায়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়েছে বলে ভোক্তাদের অভিযোগ রয়েছে। চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, শাকসবজি, ডিম, দুধ ও ব্রয়লার মুরগিসহ বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইফতার ও সাহরির প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে অতিরিক্ত চাপ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষ, বিশেষকরে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের পুষ্টি চাহিদাপূরণ এবং সকলের জন্য প্রাণিজ আমিষের বাজার সহনশীল রাখতে সারাদেশে পবিত্র রমজান মাসে সুলভ মূল্যে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গত ৪ বছর ধরে ভ্রাম্যমাণ বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এবারও ডেইরি ও পোল্ট্রি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় রমজান মাসে ঢাকা শহরে ২৫টি স্থানে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, এমপি বলেন, নির্বাচনে বিএনপি রাষ্ট্র মেরামতের যে ৩১ দফার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে-পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষি কার্ড এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা ও খাদ্য নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়গুলোকে সরকার বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে অসহায় হতদরিদ্র মানুষগুলোর জীবন-মান উন্নয়নে সরকার সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নিবে। অসহায় মানুষগুলো যাতে সুলভ মূল্যে দুধ ডিম ও মাংস নিতে পারে এবং রমজানে প্রোটিনের বাজার যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সেজন্যই প্রাণিসম্পদ অধিদফতর এ উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে সব জেলাতেই দুধ ডিম ও মাংস বিক্রির এ উদ্যোগটি নেয়া হবে। যাতে মানুষ তার খাদ্যের তালিকায় যে প্রোটিনের প্রয়োজন সে প্রোটিনের অভাব পূরণ করতে পারে। এ বিষয়ে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমান সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এবার পবিত্র রমজানে প্রাণিজ পণ্যের মূল্য স্থীতিশীল রাখা ও নিরবছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ঢাকা শহরসহ অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা শহরে নিম্ন আয়ের মানুষকে স্বস্তি প্রদানের লক্ষ্যে রমজানের আগের দিন হতে ২৫ রমজান পর্যন্ত মোট ২৬ দিন ব্রয়লার, দুধ, ডিম ও গরুর মাংস সুলভ মূল্যে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রয় করা হচ্ছে। এ বছর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্ধারিত সুলভ মূল্য তালিকা: ক) প্রতি কেজি ড্রেসড ব্রয়লারের মাংস ২৪৫ টাকা; খ) পাস্তুরিত দুধ প্রতি লিটার ৮০ টাকা; গ) ডিম প্রতি ডজন ৯৬ টাকা এবং ঘ) গরুর মাংস প্রতি কেজি ৬৫০ টাকা। এছাড়া বিভাগীয় পরিচালক ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা অন্যান্য বিভাগীয় শহরে জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, মাংস ও ব্রয়লার ভ্রাম্যমাণ বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। স্থানীয় বাজার মূল্যের সাথে সমন্বয়পূর্বক সুলভ মূল্যের দাম নির্ধারণ করা হচ্ছে। ভ্রাম্যমাণ এই বিক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবকে আহবায়ক করে ১) কেন্দ্রীয় বাস্তবায়ন কমিটি ২) পশু জবাই ও মাংসের মান যাচাই কমিটি ৩) বিক্রয়কেন্দ্র স্থান নির্ধারণ, পল সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি ৪) বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা বাস্তবায়ন কমিটি এবং ৫) বিক্রয়কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে এ কার্যক্রমে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) নির্ধারিত ভাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রে জনবল সরবরাহ ও কুলভ্যানস অন্যান্য লজিস্টিক সরবরাহ পূর্বক বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। পরিচালক (সম্প্রসারন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্ত প্রতিদিন মংস, দুধ, ডিম বিক্রয়ের তথ্যাদি সংকলিত করছেন। এবার ঢাকা ও সিটি কর্পোরেশনে প্রস্তাবিত যে ২৬ টি স্থানে এ কার্যক্রম চলছে তা হলো: ১। সচিবালয়ের পাশে (আব্দুল গনি রোড), ২। খামারবাড়ী (ফার্মগেট), ৩। ষাটফুট রোড (মিরপুর), ৪। আজিমপুর মাতৃসদন (আজিমপুর), ৫। নয়াবাজার (পুরান ঢাকা), ৬। উত্তরা হাউজ বিল্ডিং, ৭। রামপুরা বাজার, ৮। হাজারীবাগ (শিকশন), ৯। আরামবাগ (মতিঝিল), ১০। কালশী (মিরপুর), ১১। যাত্রাবাড়ী (মানিক নগর গোলির মুখ), ১২। শাহজাদপুর (বাচ্চা), ১৩। কড়াইল বস্তি, বনানী, ১৪। কামরাঙ্গীর চর, ১৫। খিলগাঁও (রেল ক্রসিং দক্ষিণে), ১৬। নাখাল পাড়া (লুকাস মোড়), ১৭। সেগুন বাগিচা (কাঁচা বাজার), ১৮। মোহাম্মদপুর (বাবর রোড), ১৯। মোহাম্মদপুর (বসিলা), ২০। কাকরাইল, ২১। বনশ্রী, ২২। মিরপুর ১০, ২৩। কল্যানপুর, ২৪। তেজগাঁও এবং ২৫। পুরান ঢাকা (বঙ্গবাজার) ২৬। কড়াইল বস্তি । উল্লেখ্য ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে গত বছর (২০২৫ সালে) ২৮ রমজান পর্যন্ত সারাদেশের ৮ বিভাগে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় ৫৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৩১ টি ডিম, ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৫২৬ লিটার দুধ, ৬০৭ টন ১৭২ কেজি ড্রেসড ব্রয়লার, ২২৬ টন ৫৯৭ কেজি গরুর মাংস এবং খাসির মাংস ১১ টন ৪৪২ কেজি বিক্রয় করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশের ৬,০৮,৬৭৪ জন পুরুষ এবং ৩,৪৩,৩৪১ জন মহিলাসহ মোট ৯,৫১,০১৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে সুলভল্যে পণ্য বিতরণ করা হয়। ফলশ্রুতি-তে সারাদেশে মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য স্থিতি-

শীলতা বজায় ছিল। অসাধু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; আমদানিকারক ও খামারিদের জন্য সহজলভ্য ঋণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা ; সরকার কর্তৃক ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রির পরিধি বাড়ানো; স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতি রোধে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। বিশেষকরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এ মহৎ উদ্যোগ প্রান্তিক পর্যায়ে বছরব্যাপী চলমান থাকলে, বছরজুড়ে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ সুলভ মূল্যে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করতে পারবে। এতে করে একদিকে মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি গ্রহণের সুযোগ পাবে, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতিজনিত ভীতি কাটিয়ে মানুষ স্বস্তির বাতাস পাবে। **(প্রতিবেদক: মো. সামছুল আলম, গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)**

"সরকারের মহৎ উদ্যোগে স্বস্তি মেলে সাধারণ মানুষে"

নাটোর থেকে হাজার কোটির তাজা মাছ যাচ্ছে সারা দেশে

দুই যুগ আগেও এ দেশের মানুষ ফরমালিনের কারণে বাজার থেকে মাছ কিনতে ভয় পেতেন। এই রাসায়নিক প্রতিরোধে প্রশাসনকে তৎপর থাকতে হতো। তবে পরিস্থিতি এখন বদলেছে। ভোক্তারা এখন বাজারে গিয়ে পুকুরের তাজা মাছ কিনতে পারছেন। সারা দেশের বাজারে এই তাজা মাছ সরবরাহে বড় ভূমিকা রাখছেন নাটোরের মাছ ব্যবসায়ীরা। এখান থেকে প্রতিদিন অন্তত ৫০০ মেট্রিক টন জীবন্ত মাছ সরাসরি দেশের বিভিন্ন বাজারে যাচ্ছে। বছরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় লাখ ৮২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন। গড়ে ৪০০ টাকা কেজি হিসাবে এসব মাছের মূল্য দাঁড়ায় ৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। মাছ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, দেশে মাছ উৎপাদনে এগিয়ে থাকা নাটোর জেলায় পুকুরের ছড়াছড়ি। আছে চলনবিল, হালতি বিলসহ অজস্র খাল-বিল। জেলা মৎস্য বিভাগের হিসাবে, নাটোরে প্রতিবছর এক লাখ মেট্রিক টনের মতো মাছ উৎপাদিত হয়। তবে বাস্তবে এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ। মাছের এই উৎপাদন স্থানীয় চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। চাহিদার অতিরিক্ত এসব মাছ ১৯৯৮ সালে যমুনা সেতু উদ্বোধনের আগে পর্যন্ত ফরমালিন ব্যবহার করে ও বরফজাত করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হতো। এতে ব্যবসায়ীরা দাম কম পেতেন, অনেক মাছ পচে নষ্ট হতো। ২০০০ সাল থেকে এ পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। মাছ ব্যবসায়ীরা পুকুর থেকে মাছ ধরে পানিভর্তি ট্রাকে করে সরাসরি ঢাকার বাজারে নিয়ে যেতে শুরু করেন। মাত্র ৪-৫ ঘণ্টার মধ্যে জীবন্ত মাছ চলে যাচ্ছে ভোক্তার ব্যাগে। অল্প সময়ে শহরের ক্রেতাদের কাছে তাজা মাছের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। মাছ সরবরাহকারীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ঢাকা ছাড়াও গাজীপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালীতে তাজা মাছের বাজার সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে প্রতিদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাটোর জেলা থেকে অন্তত ৫০০ ট্রাক তাজা মাছ বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতি ট্রাকে গড়ে এক টন করে মাছ নিয়ে যাওয়া হয়। জীবন্ত মাছ পরিবহনের জন্য ছোট ট্রাকের পেছনের অংশকে 'মোবাইল ফিশ ট্যাংক'-এ পরিণত করা হয়। খরচ কমাতে অনেকে ধাতব ট্যাংকের পরিবর্তে শক্ত পলিথিন ব্যবহার করেন। ট্যাংকের সামনের ওপরের অংশে বসানো হয় পানি ওঠানোর শ্যালো ইঞ্জিনচালিত পাম্প। এই পাম্প দিয়ে ট্যাংকে থাকা পানি তুলে আবার ট্যাংকেই ফেলা হয়, যেন বাতাসের অক্সিজেন প্রতিনিয়ত পানিতে মিশতে পারে। এরপর

পুরো ট্যাংক জাল দিয়ে মোড়ানো হয়, যেন মাছ লাফিয়ে বাইরে না পড়তে পারে। সর্বশেষ পুকুর থেকে মাছ ধরে সরাসরি ওই ট্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়। দূরত্বভেদে মাঝেমধ্যে পানি বদলানো হয়। কেউ কেউ অধিক সুরক্ষার জন্য ট্যাংকের পানিতে অক্সিজেন ব্যাগ ও স্যালাইন ব্যবহার করেন। চলন্ত ট্রাকের ঝাঁকুনিতে সৃষ্টি হওয়া পানির ঢেউ ও পাম্পের পানির প্রবাহ মাছকে তাজা রাখতে সহায়তা করে। ফলে পুকুর থেকে মাছ অনায়াসে দূরের গন্তব্যে জীবন্ত অবস্থায় পৌঁছে যায়। ব্যবসায়ীরা তাজা মাছ নিয়ে নির্বিঘ্নে দেশের যেকোনো বাজারে যেতে পারছেন। বাজার যাচাই করে ন্যায্যমূল্যে মাছ বিক্রি করতে পারছেন। স্থানান্তরের প্রয়োজনে বিপুলসংখ্যক পরিবহন ও পরিবহন শ্রমিকের কাজের সুযোগ

হচ্ছে। ভোক্তারা টাটকা মাছ খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ফরমালিনসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের প্রভাব থেকে রক্ষা পাচ্ছেন। পচা বা নষ্ট মাছ খাওয়া লাগছে না। নাটোর সদর উপজেলার প্রবীণ মাছচাষি গোলাম নবী। তিনি ১৯৮১ সাল থেকে মাছ চাষ করছেন। তার ভাষ্য, আগে নাটোরের উদ্বৃত্ত মাছ ঢাকাসহ বাইরের জেলায় পাঠানো ছিল দুঃসাধ্য। যমুনা সেতু হওয়ার পর দূরের জেলাগুলোর সঙ্গে নাটোরের দূরত্ব কমে আসে। এর কয়েক বছর পর থেকে তাদের মধ্যে জীবন্ত মাছ বাজারজাত করার ধারণা জন্মে। পরিবহন খরচ ও সময় কমে আসায় জেলার ২৫ হাজার মাছচাষির মধ্যে অন্তত এক হাজার চাষি এই পদ্ধতিতে মাছ বাজারজাত করতে শুরু করেন। নাটোর সদর ও লালপুর উপজেলায় দীর্ঘদিন জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন নাজিম উদ্দিন। তিনি বলেন, তাজা মাছ বাজারজাত করার ধারণাটা প্রথমে নাটোরের চাষিদের কাছ থেকেই আসে। প্রথমে সীমিত আকারে হলেও এখন প্রতিদিন অন্তত ৫০০ ট্রাক তাজা মাছ বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছে। তবে নাটোরের পাশাপাশি এখন নওগাঁ ও রাজশাহী জেলা থেকেও তাজা মাছ অন্যত্র যাচ্ছে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ওমর আলী বলেন, জীবন্ত মাছ বাজারজাত করার কর্মকাণ্ড এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। ভোক্তাদের ফরমালিনমুক্ত মাছ উপহার দিচ্ছে। এটা সবার জন্যই ইতিবাচক। **(সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ জানুযারি ২০২৬)**

৭ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত 'জাতীয় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৬' পালিত হচ্ছে "জাটকা ধরা থামাই যদি, ইলিশে ভরবে সাগর-নদী" এ স্লোগানকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশে ইলিশ সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৭ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত 'জাতীয় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৬' পালিত হচ্ছে ।

নিষেধাজ্ঞা ও আইনঃ ০১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের ইলিশ (জাটকা) আহরণ, পরিবহন, মজুত ও বিপণন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই আইন অমান্য করলে ২ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

কর্মসূচিঃ সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জেলেদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা, র‍্যালি, প্রচারপত্র বিলি, নৌ-র‍্যালি এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ।

১টি গরু থেকে সফল খামারি জহিরুল ইসলাম

মো. জহিরুল ইসলাম নামটি কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলার আশকামতা গ্রামের একজন পরিশ্রমী ও সফল খামারির প্রতীক। পেশাগতভাবে তিনি গবাদিপশুর খাদ্য বিক্রেতা হলেও, তার পরিচয়ের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে একজন দক্ষ ও সচেতন খামারি হিসেবে। আজ থেকে প্রায় ১৪ বছর আগে তার খামার যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র একটি গরু দিয়ে। সে সময় খামার বলতে বড় কোনো অবকাঠামো বা আর্থিক বিনিয়োগ ছিল না, ছিল শুধু আগ্রহ, ধৈর্য এবং শেখার মানসিকতা। গরু পালনের পাশাপাশি তিনি গবাদিপশুর খাদ্য বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যা তাকে পশুখাদ্য সম্পর্কে বাস্তব ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে তার খামার ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করে তোলে। ধীরে ধীরে একটি গরু থেকে আজ তার খামারে গরুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১টিতে। তার খামারের সবগুলো গরুই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের, যা দুধ উৎপাদনের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত। উন্নত জাত নির্বাচনের পাশাপাশি তিনি গরুর স্বাস্থ্য, খাবার ও পরিচর্যার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর ফলেই তার খামার থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ৩-৪টি গরু বিক্রি করতে সক্ষম হচ্ছেন, যা তার পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় বড় ভূমিকা রাখছে। খাবারের ক্ষেত্রে তিনি স্বনির্ভরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। খামারের গরুগুলোর জন্য তিনি তিন কানি জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করেন, যা সারা বছর সবুজ ও পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করে। এর পাশাপাশি তিনি খর, ভুসি ও চাউলের কুঁড়া খাওয়ান, যা গরুর পুষ্টি চাহিদাপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার কারণেই তার গরুগুলো সুস্থ, সবল এবং উৎপাদনক্ষম। জহিরুল ইসলামের এই সফলতার পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার অধ্যবসায় ও শেখার আগ্রহ। তিনি নিয়মিতভাবে নতুন তথ্য জানার চেষ্টা করেন, সফল খামারিদের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করেন এবং নিজের খামারে তা প্রয়োগ করেন। সবশেষে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মুদ্রণ সামগ্রী বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। **(প্রতিবেদকঃ সুরাইয়া আক্তার, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস কুমিল্লা)**

মাছ চাষে ফরহাদ এর বাৎসরিক আয় ১১ লক্ষ টাকা

"মাছের পোনা দেশের সোনা" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় মুসলিমের মোড় ফরহাদ নামের এক যুবক মাছ চাষ করে সফল হয়েছে। বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে খামার থেকে বছরে আয় হয় ১১ লক্ষ টাকা। ফরহাদ হোসেন এর বাবা ছিলেন একজন মৎস্যজীবী । ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন , তিনি বড় হয়ে মাছ চাষ করবেন । রাজশাহীতে প্রত্যন্ত গ্রামে ফরহাদ এর জন্ম । ফরহাদ পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভালো চাকরি পাচ্ছিল না। তখন সে ভাবল, চাকরির পিছনে না ঘুরে নিজেই কিছু করবে। সেই চিন্তা থেকেই ফরহাদ তার বাবার ছোট পুকুরে মাছ চাষ করবে সিদ্ধান্ত নিল । শুরুতে তার কাছে বেশি টাকা ছিল না। তাই সে স্থানীয় মৎস্য অফিস থেকে পরামর্শ নিল এবং অল্প পুঁজি দিয়ে রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের পোনা চাষ শুরু করল। প্রথম দিকে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল। কখনো মাছের রোগ হতো, কখনো খাবারের সমস্যা হতো। কিন্তু ফরহাদ হাল ছাড়েনি। সে নিয়মিত পুকুরের পরিচর্যা শুরু করলো, ঠিকমতো খাবার দিত এবং মৎস্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিত। এক বছর পর থেকে মাছ বিক্রি করে ভালো মুনাফা করতে লাগলো । সেই লাভ দিয়ে সে আরও একটি পুকুর লিজ নিল এবং মাছ চাষ শুরু করে । কয়েক বছরের মধ্যে ফরহাদ গ্রামের একজন সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠল। এখন তার খামারে কর্মচারী কাজ করে এবং সে অন্য তরুণদেরও মাছ চাষ করতে উৎসাহ দেয়। ফরহাদে ইচ্ছে অনেক আগে থেকেই বাবার সঙ্গে মাছ চাষে যুক্ত হবেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ আমি নিজেই পুকুর লিজ নিয়ে চাষ করি। প্রথমে তিন বিঘা দিয়ে শুরু করলেও এখন পর্যন্ত বাবা আর আমি মিলে প্রায় ৪০ বিঘার মত পুকুর চাষ করি। যেখানে ৫ জন কর্মচারী থাকে তাদের মাসিক বেতন ১৫,০০০ হাজার টাকা । ফরহাদ বলেন, শুধু ৫ জন কর্মচারী দিয়েও হয় না । তারে সঙ্গে আমি আর বাবা দুজন মিলে ২৪ ঘন্টায় দেখ ভাল করি। বাবা আগে থেকেই প্রচুর পরিশ্রম করে তার পরিশ্রমের ফলে আমরা এত দূর এগিয়ে আসতে পেরেছি । যার কারণে প্রত্যেক বছর আমরা ৫০ থেকে ৫৫ লাখ টাকার মাছ বিক্রি করি । এবং বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক খরচ বা দিয়ে ১১ লক্ষ টাকা বছরে আয় হয়। পরিশেষে, খামারিকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে লিফলেট ও ফোল্ডার বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়। **(প্রতিবেদক: মো. ছামছুল হক, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস,রাজশাহী।)**

গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিক টুনার হাতছানি

বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাণিজ্যিকভাবে টুনা আহরণের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। সাম্প্রতিক এক জরিপের প্রাথমিক ফলাফলে স্কিপজ্যাক টুনা ও টুনার লার্ভার উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ায় এ খাতে বিনিয়োগ ও শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ জোরদার করছে সরকার। এ লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি বা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও পরীক্ষামূলক নমুনা আহরণের উপযুক্ত জাহাজ ভাড়া নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সহযোগিতায় নরওয়ের গবেষণা জাহাজ 'ড. ফ্রিডটজফ নানসেন' বঙ্গোপসাগরে এই জরিপ চালায়। ইএএফ-নানসেন সার্ভে ২০২৫ নামে এই জরিপে গভীর সমুদ্রে ছয়টি এলাকা ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় আহরণযোগ্য স্কিপজ্যাক টুনা ও টুনার লার্ভার উপস্থিতি মিলেছে। গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে নেওয়া পাইলট প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. মো. জুবায়দুল আলম। তিনি বলেন, টেকসই ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর টুনা ফিশিং শিল্প গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে সমীক্ষা ও মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে চারটি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হবে। বাছাই করা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দুটি লং-লাইনার টুনা ভেসেল ভাড়া করে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৭ সালের মার্চ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় ১২টি ক্রুজ পরিচালনা করবে। মৎস্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক খন্দকার মাহবুবুল হক বলেন, বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে (ইইজেড) টুনার উপস্থিতি তুলনামূলক কম হলেও এর বাইরে বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় টুনার প্রাচুর্য বেশি। বিশ্বে টুনা

নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জরিপ না থাকলেও কিছু দেশের কাছে আঞ্চলিক উপস্থিতির তথ্য রয়েছে। জরিপ সংশ্লিষ্ট মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল-মামুন জানান, বাংলাশের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে প্রথমবারের মতো স্কিপজ্যাক টুনা ও অন্যান্য প্রজাতির উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। ট্রলার ও হুক-অ্যান্ড-লাইন পদ্ধতিতে স্কিপজ্যাক টুনা ধরা হয়েছে এবং টুনার ঝাঁকও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্কিপজ্যাক টুনা ছোট আকারের পরিযায়ী প্রজাতি, যা উষ্ণ ও উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় সাগরে পাওয়া যায়। এটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রজাতি। দেশের উপকূল থেকে ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মাছটির উপস্থিতি পাওয়া গেছে। তবে এদের বিস্তৃতি আরও গভীর সমুদ্র পর্যন্ত। সূত্র জানায়, ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৮টি লং-লাইনার, ৮টি পার্স সেইনার এবং দুটি

সহায়ক জাহাজ আমদানি বা নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হলেও বেসরকারি খাতের আগ্রহের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১৮ সালে ইন্ডিয়ান ওশান টুনা কমিশনের (আইওটিসি) সদস্য হওয়ায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমায় মাছ ধরার অধিকার পেয়েছে। তবে এ সদস্যপদের জন্য বছরে প্রায় ৭০ হাজার মার্কিন ডলার চাঁদা দিতে হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকার ২০ শতাংশ উপকূলীয়, ৩৫ শতাংশ অগভীর এবং ৪৫ শতাংশ গভীর সমুদ্র অঞ্চল। ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত দেশের জলসীমা, এরপর আন্তর্জাতিক জলসীমা শুরু। তবে দেশের কোনো জাহাজই এখনও আন্তর্জাতিক জলসীমায় গিয়ে মাছ ধরে না। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে ২৩০টি জাহাজ মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে এবং উপকূলীয় ও অগভীর সাগরে প্রায় ৩০ হাজার ছোট নৌকা সক্রিয়। এছাড়া সামুদ্রিক সম্পদ অনুসন্ধানে 'আরভি মীন সন্ধানী' গবেষণা জাহাজ ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখ্য, টুনা আহরণ প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১ দশমিক ৪৫ কোটি টাকা।
(সূত্র: তরিকুল ইসলাম সুমন, সাংবাদিক, দৈনিক জাতীয় অর্থনীতি)

"বেশি বেশি সামুদ্রিক মাছ খাই, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাই"

গরুর খামারেই জ্বালানির সমাধান নুরুল হুদার

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা-এর মানুষি ফুলশ্রী গ্রামের বাসিন্দা নুরুল হুদা নিজ উদ্যোগে বায়োগ্যাস ও গরুর খামার গড়ে তুলে হয়েছেন সফল এক খামারি। ২০২২ সালে তিনি সবুজ শক্তি এর সহায়তায় একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেন, যার স্থায়িত্ব প্রায় ২৫ বছর। এই প্ল্যান্ট সচল রাখতে প্রতিদিন প্রায় ৬০ কেজি গোবর প্রয়োজন হয়, যা তিনি নিজ খামার থেকেই সংগ্রহ করেন। এই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে প্রতিদিন প্রায় ৪ ঘন্টা গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাস দিয়ে তার ৪-৫ সদস্যের পরিবারের দৈনন্দিন রান্নার কাজ সহজেই সম্পন্ন হয়। ফলে তার জ্বালানি খরচ অনেক কমে গেছে এবং পরিবেশবান্ধব একটি জীবনধারায় অভ্যস্ত হতে পেরেছেন। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে উৎপন্ন স্লারি তিনি নিজস্ব উদ্যোগে সবজি চাষ ও ঘাষ চাষে ব্যবহার করছেন। এই জৈব স্লারি ব্যবহারের ফলে তার উৎপাদিত সবজি স্বাস্থ্যসম্মত হচ্ছে এবং অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের প্রয়োজন পড়ছে না। নুরুল হুদা প্রথমে মাত্র ৩টি গরু দিয়ে খামার শুরু করলেও বর্তমানে তার খামারে রয়েছে মোট ১৭টি গরু। ধীরে ধীরে গরুর সংখ্যা বাড়িয়ে তিনি একটি সফল ও লাভজনক খামার গড়ে তুলেছেন। তার খামারের গরুগুলো থেকে প্রতিদিন যে গোবর পাওয়া যায়, সেটিই বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে গরুর খামার ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এই দুটি উদ্যোগ একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে একটি টেকসই ব্যবস্থা তৈরি করেছে। আগৈলঝাড়া উপজেলার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব পলাশ সরকার (পিএএ) বলেন, "এটি একটি পরিবেশবান্ধব ও লাভজনক উদ্যোগ। গরুর খামার থেকে প্রাপ্ত গোবর ব্যবহার করে বায়োগ্যাস ও জৈব সার উৎপাদনের মাধ্যমে নুরুল হুদা একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।" মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর থেকে তাকে গবাদিপশু পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন লিফলেট ও তথ্যসামগ্রী বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে, যা তার খামার পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করে নুরুল হুদা শুধু নিজের পরিবারের জ্বালানির চাহিদাই পূরণ করছেন না, পাশাপাশি জৈব সার উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছেন।
(প্রতিবেদক: জান্নাতুল ফেরদৌস, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস বরিশাল।)

নারীর অধিকার কেবল স্বীকৃতিতে নয়, বাস্তবায়নেও গুরুত্ব দিতে হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, নারীর অধিকার কেবল স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং তা বাস্তবায়নেও গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পর দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন না এলে নারীদের এই অগ্রগতি সম্ভব হতো না। আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে "আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার–সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৮ মার্চ রবিবার বিকেলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর সূচনা করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭৮ সালে নারী উন্নয়নের জন্য বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এবং নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। বিশেষ করে পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নারীদের প্রথমবারের মতো নিয়োগের সুযোগও তাঁর সময়েই চালু হয়। বর্তমানে বিভিন্ন খাতে-বিশেষ করে প্রাণিসম্পদখাতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং সাফল্য উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, কাজের মান ও ফলাফলের দিক থেকেও নারীরা এগিয়ে রয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান বিভিন্ন সময়ে তাঁর বক্তব্যে নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জীবনে নারীদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-বিশেষ করে তাঁর মা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সহধর্মিণী ডা. জোবায়দা রহমান এবং কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমানের কথা প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার পরিবারে নারীর সম্মান ও স্বাবলম্বীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ফ্যামিলি কার্ড' নারীদের নামে দেওয়ার চিন্তা করা হয়েছে, যাতে নারীরা সংসারে আরও মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পান। তিনি আরও বলেন, বিএনপি বিশ্বাস করে বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী বিএনপিকে সমর্থন করেন। নারীদের জন্য আলাদা যানবাহন ব্যবস্থার উদ্যোগসহ নারীর নিরাপত্তা ও কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সরকার সবসময় তাদের পাশে থাকবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে

সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বিএনপির মূল দর্শন হলো-"সবার আগে বাংলাদেশ।" দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারেও নারীর মর্যাদা ও অধিকার বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতে বর্তমানে প্রান্তিক খামারিদের বড় একটি অংশ নারী। বড়, মাঝারি ও ছোট খামার-সব ক্ষেত্রেই নারীরা সফলভাবে কাজ করছেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। অনেক নারী উদ্যোক্তা ফোরাম গঠন করে বিভিন্ন উৎপাদন ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, অতীতে একটি সরকার সমাজে বৈষম্য তৈরি করেছিল, যেখানে অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়া হতো। তিনি বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে দলীয় বিবেচনার পরিবর্তে মেধা ও যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করতে বর্তমান বিএনপি সরকার কাজ করছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. ইমাম উদ্দীন কবীর, তাছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রতিমন্ত্রী নারী কর্মকর্তাদের মাঝে নারী দিবস উপলক্ষ্যে ক্রেস্ট বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষা, সমতা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান (সিনিয়র তথ্য অফিসার) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)**

"নারীর হাতে খামার
সমৃদ্ধ হবে পরিবার"

তীব্র তাপদাহে মৎস্য চাষিদের করণীয়

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা অনেক সময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। এই তীব্র তাপদাহের প্রভাব সরাসরি পুকুর, ঘের ও অন্যান্য জলাশয়ের ওপর পড়ে। পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং মাছ মারাত্মক স্ট্রেসে পড়ে। ফলে মাছের খাবার গ্রহণ কমে যায়, রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটতে পারে। সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করলে এই ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। নিচে তাপদাহে মৎস্য খামারিদের জন্য প্রয়োজনীয় করণীয়গুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

১। পুকুরের তলদেশ পরিষ্কার রাখা: দিনের বেলায় জাল বা হররা টেনে পুকুরের তলদেশে জমে থাকা পঁচা ঘাস, কাদা ও গ্যাস বের করে দিতে হবে। এতে পানির নিচে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাস (যেমন: অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড) কমে যায়।

২। চুন প্রয়োগ: প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রতি শতকে ১০০-২০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করলে পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং জীবাণুর আক্রমণ কমে।

৩। লবণ ব্যবহার: প্রয়োজনে প্রতি শতকে ১০০-২০০ গ্রাম লবণ পানিতে গুলে বিকালে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি মাছের স্ট্রেস কমাতে সহায়ক।

৪। সার প্রয়োগ বন্ধ রাখা: তাপদাহ চলাকালীন সময়ে ইউরিয়া বা অন্যান্য রাসায়নিক সার প্রয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে। অতিরিক্ত সার পানির গুণগত মান নষ্ট করে।

৫। খাদ্যের পরিমাণ কমানো: মাছের স্বাভাবিক দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ অর্ধেক বা পরিস্থিতি অনুযায়ী কমাতে হবে। অতিরিক্ত খাদ্য পানিতে পঁচে অক্সিজেন কমিয়ে দেয়।

৬। খাবার দেওয়ার সময় পরিবর্তন: দুপুরের তীব্র গরমে খাবার না দিয়ে সকাল ও বিকালের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা সময়ে খাবার প্রদান করা উচিত।

৭। ভাসমান খাদ্য ব্যবহার: ভাসমান খাদ্য ব্যবহার করলে অবশিষ্ট খাবার দেখা যায় এবং অপচয় কমানো যায়।

৮। পানির গভীরতা বজায় রাখা: পুকুরে কমপক্ষে ৪-৫ ফুট পানি রাখা উচিত। কম গভীর পানিতে তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৯। ঠান্ডা পানি সংযোজন: সম্ভব হলে গভীর নলকূপ বা নিরাপদ উৎস থেকে দুপুরের পর কিছু পরিমাণ ঠান্ডা পানি সরবরাহ করা যেতে পারে।

১০। এয়ারেটর ব্যবহার: দুপুরের পর অন্তত ১ ঘণ্টা এবং গভীর রাতে কমপক্ষে ২ ঘণ্টা এয়ারেটর চালানো উচিত। এতে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা বজায় থাকে।

১১। অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রয়োগ: অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিলে প্রতি শতকে প্রতি ফুট পানির গভীরতায় ১টি করে অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১২। মাছের ঘনত্ব কমানো: অতিরিক্ত ঘনত্বে মাছ চাষ করলে তাপদাহে অক্সিজেনের ঘাটতি দ্রুত হয়। তাই প্রয়োজন হলে আংশিক আহরণ করতে হবে।

১৩। আংশিক মাছ আহরণ: বড় আকারের মাছ বিক্রি করে দিলে পুকুরে চাপ কমে এবং বাকি মাছের বৃদ্ধি ভালো হয়।

১৪। ছায়ার ব্যবস্থা: পুকুরের একটি অংশে শেড নেট ব্যবহার করে আংশিক ছায়া তৈরি করা যেতে পারে।

১৫। আগাছা নিয়ন্ত্রণ: অতিরিক্ত জলজ আগাছা সরিয়ে ফেলতে হবে, তবে সম্পূর্ণ পরিষ্কার না করে কিছু অংশ রাখা যেতে পারে।

১৬। প্রোবায়োটিক ব্যবহার: অনুমোদিত প্রোবায়োটিক প্রয়োগ করলে পানির ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া কমে এবং পানির গুণগত মান উন্নত হয়।

১৭। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা: তাপদাহে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই নিয়মিত মাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ জরুরি।

১৮। পানি হঠাৎ পরিবর্তন না করা: হঠাৎ সম্পূর্ণ পানি পরিবর্তন করলে মাছ শকে আক্রান্ত হতে পারে।

১৯। লবণ সরাসরি প্রয়োগ না করা: লবণ আগে পানিতে গুলে সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

২০। অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার এড়ানো: অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বা রাসায়নিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

২১। নিয়মিত পানি পরীক্ষা: পানির তাপমাত্রা, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন ও এ্যামোনিয়া নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত।

২২। মাছের আচরণ পর্যবেক্ষণ: ভোরবেলা মাছ পানির উপরে ভেসে উঠছে কিনা তা খেয়াল রাখতে হবে।

২৩। বিদ্যুৎ বিকল্প ব্যবস্থা: লোডশেডিং হলে এয়ারেটর চালানোর জন্য জেনারেটর প্রস্তুত রাখা ভালো।

২৪। পুকুরের কাদা অপসারণ: শুকনা মৌসুমে অতিরিক্ত পলি বা কাদা অপসারণ করা উচিত।

২৫। রেকর্ড সংরক্ষণ: প্রতিদিনের খাদ্য, পানি পরীক্ষা ও মাছের আচরণ লিখে রাখলে সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করা যায়।

২৬। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ: নিকটস্থ উপজেলা বা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে হবে।

তীব্র তাপদাহের সময় সামান্য অবহেলাও বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। তবে সঠিক পরিকল্পনা, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে মাছের মৃত্যুহার কমানো এবং উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। সচেতন খামারিই পারেন এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে লাভজনক চাষ নিশ্চিত করতে। **(লেখক: মাহবুবা খানম, তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)**

"তীব্র তাপে মাছের যত্ন
মাছ হবে দেশের রত্ন "

তীব্র তাপদাহে প্রাণিসম্পদ খামারিদের করণীয়

গ্রীষ্মকালে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে টানা কয়েকদিন ধরে যে অসহ্য গরম আবহাওয়া বজায় থাকে, তাকে তীব্র তাপদাহ বা হিট ওয়েভ (Heat Wave) বলে । সাধারণত তাপমাত্রা ৪০-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি হলে একে তীব্র তাপদাহ হিসেবে গণ্য করা হয় । এর ফলে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যায় । তাপপ্রবাহ হলো এমন পরিস্থিতি যেখানে অল্প সময়ের মধ্যে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং দ্রুত খাদ্য ও পানির সংকট দেখা দেয় । তাপপ্রবাহ বা তাপদাহে গবাদিপশুর দুধ ও মাংস উৎপাদনে সরাসরি প্রভাব ফেলে । এছাড়া গবাদিপশুর ডিহাইড্রেশন, প্রস্রাব কমে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং মারাত্মক ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাপ প্রবাহজনিত পীড়ন সহনীয় করতে খামারিদেরকে কিছু ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করতে হবে ।

১. গবাদি প্রাণী বা পোল্ট্রির ঘর শীতল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে । এজন্য শেডের চালে ভেজা চট বা বস্তা বা কাপড় বিছিয়ে দিতে হবে এবং সময়ে সময়ে তাতে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে । ঘরের ভিতরেও ভেজা চট বা বস্তা বা কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে তা ঘরের ভিতরের তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করবে ।

২. শেডের চালের উপরিভাগে প্রতিফলক রং করা যেতে পারে । ভিতরে সহজলভ্য ও সস্তা উপাদানের যেমন-চাটাই, ছন,খড় ইত্যাদি ফলস সিলিং লাগিয়ে দিলে ঘর অনেক ঠান্ডা থাকবে ।

৩. শেডের উপরে সরাসরি সূর্যের তাপ প্রতিরোধে রঙিন পলিথিন সামিয়ানার মতো করে টানিয়ে দেওয়া যেতে পারে ।

৪.ঘরের ভিতরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনে ফ্যান ব্যবহার করতে হবে। গবাদি প্রাণীকে দিনে একাধিকবার গোসল করানো বা পাইপের সাহায্যে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে ।

৫. গবাদি প্রাণী বা পোল্ট্রিকে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করতে হবে । পানির সাথে উপযুক্ত পরিমাণে লবণ, ভিটামিন সি, ইলেক্ট্রোলাইট, গ্লুকোজ বা অ্যামাইনো এসিড ইত্যাদি মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে ।

৬. সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সময়ে আবদ্ধ ঘরে বা খোলা মাঠে গবাদি প্রাণীকে না রেখে প্রাকৃতিক ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে ।

৭. গবাদি প্রাণীকে খড় বা অতি পরিপক্ক শক্ত আঁশযুক্ত খাবার সরবরাহ পরিহার করে নরম কচি ঘাস সরবরাহ করতে হবে । হজমের সময় তাপ বৃদ্ধি কমাতে দুধেল গাভীকে কম আঁশ এবং উচ্চ শক্তি সম্পন্ন খাবার সরবরাহ করলে তা হিট স্ট্রেস কমাতে কার্যকরি ভূমিকা পালন করে ।

৮. দিনের অতিরিক্ত গরমের সময়ে খাদ্য সরবরাহ কমিয়ে শীতল সময়ে খাদ্য সরবরাহ বাড়ানো ভালো। সম্ভব হলে মিনারেল মিক্সচার বক্স সরবরাহ করতে হবে ।

৯. প্রচন্ড গরমে পারত পক্ষে কৃমিনাশক ব্যবহার বা টিকা প্রদান কিংবা গবাদি প্রাণী পরিবহন পরিহার করা উত্তম। দিনের অপেক্ষাকৃত শীতল সময়ে এ কাজগুলো করা যেতে পারে । মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তীব্র তাপপ্রবাহ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, টিকা কর্মসূচি, পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে । উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করলে খামারিরা সরাসরি সহায়তা পান । তাপপ্রবাহকে এখন নিয়মিত ঝুঁকি হিসেবে ধরেই পরিকল্পনা করতে হবে । খামারে খাদ্য ভাণ্ডার রাখতে হবে, বিকল্প পানির উৎস নিশ্চিত করতে হবে এবং নিয়মিত পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে । প্রস্তুত থাকলে ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। **(লেখক: ডা. মনিরুজ্জামান তরফদার, তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ।)**

সম্মানিত লেখকদের প্রতি আহ্বান :

প্রিয় সুহৃদ,

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর হতে "আমিষ বার্তা "নামে একটি ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে । আমাদের সৃজনশীল এই যাত্রায় আপনাকে স্বাগত । আমাদের ম্যাগাজিনের আসন্ন ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে । আপনি যদি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উদ্ভাবন, সফলতার গল্প ও প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে চান, তাহলে আমাদের সঙ্গে লেখা পাঠিয়ে যুক্ত হন ।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ১৫ ই জুন ২০২৬

লেখার পরিমাণ: সর্বোচ্চ ১২০০ ওয়ার্ড (অবশ্যই সুতনী এম জে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে)

লেখার সঙ্গে লেখকের পূর্ণ পরিচয় ও পাসপোর্ট সাইজের ছবি(সফট কপি)

ইমেইল /যোগাযোগ: headquarter@flid.gov.bd

০১৭১৭৬০৮৬২২ (Whats app)

 # আপনার লেখাই হতে পারে আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ।

বিড়ালের জন্য ক্ষতিকর খাবারসমূহ

মানুষের জন্য যা নিরাপদ, বিড়ালের জন্য তা ক্ষতিকর হতে পারে

ত্রৈমাসিক

আমিষ বার্তা

মাঘ-চৈত্র ১৪৩২
জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা